

# किशोरा साधनासमिश्र

श्री अनाथ शिखर



কিশোর রচনাসমগ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

# সূচিপত্র

---

## উপন্যাস

বউ-ঠাকুরানীর হাট

### গল্প

পোস্টমাস্টার  
রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা  
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন  
কাবুলিওয়ালা  
ছুটি  
অতিথি  
ইচ্ছাপূরণ  
বলাই  
সে  
বিজ্ঞানী  
রাজার বাড়ি  
বড়ো খবর  
চণ্ডী  
রাজরানী  
মুনশি  
ম্যাজিশিয়ান  
পরী  
আরও-সত্য  
ম্যানেজারবাবু  
বাচস্পতি  
পান্নালাল  
চন্দনী  
ধ্বংস  
ভালোমানুষ  
মুক্তকুন্তলা  
পরীর পরিচয়

রাজপুত্রর  
মীনু  
নামের খেলা  
সুয়োরানীর সাধ  
ঘোড়া  
কর্তার ভূত  
তোতাকাহিনী  
নতুন পুতুল

উপন্যাস

# বউ-ঠাকুরানীর হাট

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তো আর কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার সিংহাসনের তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কী তপস্যা করিলে এ-সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে!"

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না, এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতিমুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদগণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল-- না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না।

সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "আহা! কেমন করিয়া পারিত!"

তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, "তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না, সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা

ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে উহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিতেন-- ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।"

সুরমা আবার কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্য-উপার্জন, রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।"

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী, কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত, পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে; রাজকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে, ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লজ্জন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

"চারিদিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পলাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন। সেখানে গাছপালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটিরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন, তাহার ত্রিসীমায় বিষাদ ভাবনা বা কঠোর গান্ধীর্ষ্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারিদিকে উল্লাস, সন্ধ্যা, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আরামের ভুল। অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।"

সুরমা বলিয়া উঠিল, "ও-কথা অনেক বার শুনিয়াছি।"

উদয়াদিত্য। আর-একবার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে-কথাগুলো যদি বাহির করিয়া না দিই, তবে আর বাঁচিব কী করিয়া। সেই কথাটা তোমার কাছে এখনও বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি। যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না।

সুরমা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না? অন্তর্যামী কি তোমার মন দেখিতে পান না?

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, "রুষ্টিগীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী বিধবা। দাদামহাশয়ের অনুগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারিদিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাষ্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বচরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র-- আর অধিক নয়-- সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যুৎবেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, ম্লান-- সে ধূলি আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা, যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।"

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্তারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, "আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক।"

উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল, সকলই তখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজ্জাটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা! কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয়, আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন।



অভিমান নাই, কিছু নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখখানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেঁধেন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা ছিল কি? তুমি আমার উষা, আমার আলো, আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে?"

যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন, "এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারই কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভালো বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ?"

কী অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেঁধেন করিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, "আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে।"

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক-একদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদগণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ওদিকে

অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।"

সুরমা। সে কী কথা নাথ। এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যিক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম! সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলই সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সাঙ্কনা দিয়াছ, শান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে, লজ্জা হইতে, রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুর-রাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে, আপনাকে, যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয়, আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।"

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকার-তোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।

শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন, "কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, "এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!"

সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কেন, কী হইয়াছে?" বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "দাদা কী হইবে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তবে চলিলাম।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না না, তুমি যাইয়ো না।"

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?

সুরমা কহিল, "ছিঃ বিভা; এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?"

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। বিভা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?"

সুরমা কহিল, "আর কী হইবে? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।"

বিভা কহিল, "না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনোপ্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?"

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।"

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কাজটা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।"

প্রতাপাদিত্য আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমউলতলির চাটিতে আশ্রয় লইবেন তখন--"

প্রতাপাদিত্য ঙ্কুশিত করিয়া কহিলেন, "তখন কী? কথাটা শেষ করিয়াই ফেলো।"

মন্ত্রী। তখন দুই জন পাঠান গিয়া--

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁহাকে নিহত করিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে! এখন বোধ করি তোমার রাজকার্যে মনোযোগ দিবার বয়স

গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন?"

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, আমি--

প্রতাপ। চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা-- আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই-- এই যে স্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই স্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে স্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন, "এ-বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনও আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিয়ো। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো বলিয়ো। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিয়ো। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ; "না" বলিয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?"

এ বিষয়ে-- অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে

সম্ভুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীৰ বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।"

প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ রুষ্ট হইবেন! রুষ্ট হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ো না।"

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বই কি। দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।"

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন, "দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।"

মন্ত্রী কহিলেন, "প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে?"

প্রতাপ। জানিতে পারিলে তো?

মন্ত্রী। এ কাজ অধিকদিন চাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলো ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক, যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "মহারাজ, দিল্লীশ্বর--" প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।"

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য--"

রাজা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই জৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।"

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, "তবে কী বলিতেছিলে বলো।"

মন্ত্রী বলিলেন, "কাল রাতে যুবরাজ সহসা অশ্বারোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোন্ দিকে গেছেন?"

মন্ত্রী কহিলেন, "পূর্বাভিমুখে।"

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, "কখন গিয়াছিল?"

মন্ত্রী। কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভালো হয়।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা-- নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহাদের মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনও ফিরিয়া আসে নাই?"

মন্ত্রী। না মহারাজ।

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই?"

মন্ত্রী। একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ। অদৃশ্যভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?

মন্ত্রী। তাহারা কোনোপ্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।

প্রতাপ। সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীরা কর্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারো ছিল ডাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোনো

একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে। তবে এ দায় তোমার।

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গস্তীরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কী বলিতেছিলে?"

মন্ত্রী। শুনলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।

প্রতাপ। কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। যেই করুক, তাহার জন্য অধিক ভাবিয়ো না, আমিই দিল্লীশ্বরের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্যোগ করিতেছি। সে পাঠানেরা এখনও ফিরিল না? উদয়াদিত্য এখনও আসিল না? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুদবেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তন্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ঝাঁঝিঁ পোকাকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সবাস্ত ঘর্মে প্লাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনও অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, "সুগ্রীব।" সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বঙ্কিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সবেগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তন্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সাঁ

সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমুলতলির চটির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, "সুগ্রীব" বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, "এত রাত্রে তুমি কে গো?" দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।"

সে কহিল, "দ্বার খুলিবার আবশ্যক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন?"

সে কহিল, "আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনও আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।"

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, "এই লও।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন, "বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?"

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "না মহাশয় তাহা হইবে না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্ধানে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুই জন সুপ্তোখিতা প্রৌঢ়া চৈতাইয়া উঠিল, "আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন?"

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোনো চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে এক জন অশ্বারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, "কে ও, রতন নাকি?" সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রে এখানে যে?"

যুবরাজ কহিলেন, তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।

"আজ্ঞা, তাঁহার তো চটিতেই থাকিবার কথা।"

"সে কী! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"



সে অবাক হইয়া কহিল, "ত্রিশ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।"

"পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?"

পাঠান কহিল, "হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।"

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ-বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, "কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরাইয়াছেন।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "এখন তোমার কী করা হয়?"

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুজুর, দুরবস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তুণকে তুণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তুণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।"

বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ওই দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।"

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দুরবস্থা। চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন, "তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।"

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "হুজুর, পারি বইকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,--"

বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-এক জন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।" এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, "আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার!" চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না-- কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ কী তারিফ!" বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, "তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?"

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

বসন্ত রায়। তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।" পাঠান ভাবিল একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সেতার বাজানো আসে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ" ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা! খাসী!" ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গান্ধীর্ষ আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, "কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।"

গান থামিলে পাঠান কহিল, "বাঃ কী চমৎকার আওয়াজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "তবে বোধ করি নিস্তর্র রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কী না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটি অর্বাচীন আছে। নহিলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদদার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন দুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাথে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।" বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখদুটি স্নেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, "তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনানো হইয়াছে, এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল-- পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, "কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন-- আমার অনুচরেরা কখন ফিরিয়া আসিবে? আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

এক জন অস্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, "আঃ বাঁচিলাম। দাদামহাশয় পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?"

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী দাদা? দিদি ভাল আছে তো?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সমস্তই মঙ্গল।"

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?  
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।  
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?  
এরি মধ্যে মিটল কি প্রণয়েরি আশ?  
এখনো তো রয়েছে রাত এখনো হয় নি প্রভাত,  
এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।  
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?  
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?"

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমঝদার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটিতে না গিয়া এখানে যে?"

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, "হজুর, আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোহরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।"

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, "রাম রাম রাম।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিয়া যাও।"

পাঠান। আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখান। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়ো না। এখন গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে ফিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।" বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, "তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ ভাই।"

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা।"

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কুলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।"

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

"মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?"

"এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?"

সকলে সমস্বরে বলিল, "সে নেড়ে বেটা কোথায়।"

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।"

প্রথম। আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে--

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না রে; আমি সমস্ত ভালো করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আম-বাগানের মধ্যে--

তৃতীয়। না রে সেটা বাবলা বন।

চতুর্থ। সেটা বাঁ-হাতি নয় সেটা ডান-হাতি।

দ্বিতীয়। দূর থেপা, সেটা বাঁ-হাতি।

চতুর্থ। তোর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি?

দ্বিতীয়। বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে পুকুরটা--

উদয়াদিত্য। হাঁ বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গাঁয়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গাঁয়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পলাইল খোঁজ পাইলাম না।

প্রথম। সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।

দ্বিতীয়। আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।

তৃতীয়। যখনই দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটা এখনও আসিল না।"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। দেরি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মন্ত্রী। শিমুলতলি এখান হইতে বিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিক দিয়া গেলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য। পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদয়াদিত্য তো পূর্বে এমনতরো ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো না!"

মন্ত্রী। আপনি মহিষীর কাছে বধুমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ-বিষয়ে আপনি অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?

এক জন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?"

পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?

পাঠান। আপনার পরামর্শ মতো আমি তাঁহার লোকজনদের তফাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য। যদি না করিয়া থাকে?

পাঠান। মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ওইখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, অসম্ভব না হন যদি তো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।"

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানিতে পারিলে?

মন্ত্রী। ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশ্যভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।"

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই-একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি বিবেচনা করিতেছি, ওই পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ-বিষয়ে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে পারিবেই।" মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তবে তো আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।"

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন-- প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না!

প্রতাপাদিত্য। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

বৃদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন-- প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।"

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্যন্ত হইল না।

বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেকদিনের পর দেখা হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।"

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বসন্ত রায় অনেকদিন বাঁচিয়া আছে-- না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলি। আমাকে বধ করিয়ো না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?"

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, "প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা--"



এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ।" বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।"

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, "মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।"

দেড় মাস পূর্বে এইরূপ একটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

"আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চুপ করো। দোষ কাটাইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।"

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে। এ সকলের অর্থ কী?"

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। যেন তপ্ত সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।" সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, "ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে

পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।" মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্যদিকে ফিরাইলেন।

এক জন পুরানো বৃদ্ধা দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।" এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ওই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী। আহা বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।" এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন "আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।"

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার স্নান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?"

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার আর কী বলিবার আছে?"

সুরমা কহিল, "অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।"

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, "এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে

তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?" বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, "আচ্ছা বিভা, তুমি যদি পুরুষ হইতিস তো কী করিতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি স্বশ্রববাড়ি যাইতিস না?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না, তাহা পারিতাম না আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম; মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া অনিলে তিনি কেন আসিবেন?"

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে রকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, "আজ কী ছেলেমানুষিই করিয়াছি।" ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, "বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?"

বিভা। দাদামহাশয় আসিয়াছেন?

সুরমা। হাঁ।

বিভা। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আসিয়াছেন?"

সুরমা। প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।

বিভা। এখনও যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না?

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি, একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, এক বারেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন।

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।

ভয় নাইকো সুখে থাকো,

অধিক ক্ষণ থাকব নাকো।

আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তরে।

দেখব শুধু মুখখানি

শুনব দুটি মধুর বাণী

আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।"

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আহ্লাদ হইয়াছে।  
অতটা আহ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।"

বসন্ত রায়। না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া জ্বলাইয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল যে, মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জ্বলাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বলাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, "না, আমি কখনো ও কথা বলি নাই। আমি কোনো কথাই কই নাই।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা তো পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।"

বসন্ত রায়। না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, "তোমার আধমাথা বই চুল নাই যে দাদামহাশয়।"

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সে একদিন গিয়াছে রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।"

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?"

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুন্ফসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আশ্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গোঁফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গোঁফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্ত রায় কহিলেন, "সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনও একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।"

বিভা কহিল, "কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।"

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।"

সুরমা। আমি বলি কি--

বিভা। শোনো না দাদামহাশয়, তোমার--

সুরমা। বিভা চুপ কর। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার--

বিভা। দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।

বসন্ত রায়। আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্রোহ ছিল।

বিভা বলিল, "কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়!"

"কেন। কেন। তাহার কি হয়েছে।" বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, "বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না!"

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন "ঠিক কথাই তো।"

সুরমা কহিল, "স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো? বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?"

সুরমা। আজ বিকেলে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।

বসন্ত রায়। বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?

সুরমা। হাঁ।

বসন্ত রায়। আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস কেন দিদি? যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি। আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গো।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিয়ো না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইয়ো না।"

বলিতে বলিতে, বসন্ত বাহির হইয়া গেলেন; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, "তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর নাই ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।"

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।"

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?" বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।

মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।"

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, "বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?"

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অঁ্যা দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

"এস, এস, ভাই এস।" বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটবৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে-সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশংকর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নান্ডিজ।

রাজা বলিলেন, "ওহে রমাই।"

রমাই বলিল, "আজ্ঞা, মহারাজ।"

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নান্ডিজ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নান্ডিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মাস্কাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকই আমোদে হাসে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী হে?"

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যিক।

"পরম্পরায় শুনা গেল সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।"

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নান্ডিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্নান্ডিজকে স্থাপন করা; রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, সুরুটির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে?"



"নিবেদন করি মহারাজ। (ফর্নান্ডিজ তাঁহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই।"

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ।

"দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরিব।" রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, "ওগো চোর আসিয়াছে।" কর্তা বলিলেন, "ওই যাঃ ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে।" চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।"

রাজা। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রাজা বলিলেন, "তার পর?"

রমাই দেখিল, এখনও রাজার তৃপ্তি হয় নাই। "জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পররাত্রেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, "সর্বনাশ হইল ওঠো।" কর্তা কহিলেন, "তুমি ওঠো না।" গিন্নি কহিলেন, "আমি উঠিয়া কি করিব।" কর্তা বলিলেন, "কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না। কিছু যে দেখিতে পাই না।" গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখো দেখি, তোমার জন্যই যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আনো।" ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, "মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।" কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, "রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়ে দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।" তামাক খাইয়া চোর কহিল, "মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাঠিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।" সেনাপতি কহিলেন, "বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস না।" বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিন্নিকে কহিলেন, "বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।"

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্নান্ডিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে "হিঃ হিঃ" করিয়া টুকরো টুকরো হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, শুনিয়াছ আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি?"

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি।) কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার,--আহারটা, সমাদরটা; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলই সার পদার্থ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই স্ত্রীটা।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ--"

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, "মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না।" (যথাক্রমে হাস্য।) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, "আমি তো শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা ও ঘরকন্নায বিশেষ পটু।"

রমাই। সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি।

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যঙ্গ কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না। রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্কুলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"

সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা আঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয় তো কী।" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আদেশ করেন তো বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করো আমার চৌষটি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে স্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।"

রমাই। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাসুল বানাইয়া দিয়াছিল।

রাজা হাসিলেন, মুখে দন্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতম মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "আপনার এক শ্যালক আসিয়া আমাকে কহিলেন, "বাসর-ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানিতাম না।" আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, "পূর্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যন্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।"

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই সুখী। ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাহগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না। এই সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন, "রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।"

রাজা কহিলেন, "তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।"

রমাই কহিল, "আপনার অসাধ্য কী আছে?"

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কী না করিতে পারেন? অনুগতবর্গের কেহ যদি বলে, "মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।" মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন, "হাঁ, তাহাই হইবে।" কেহ যেন মনে না করে এমন

কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিদ্রূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল। শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তো সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অনুচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?" বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানাপ্রকার উদ্‌যোগ করিতে হইতেছে। আহালাদিকর বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন-- বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে; কিন্তু হইলে হয় কী, বিভারে কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না-- কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে গিয়া মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন,

কেবল চুল বাঁধার দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পরিয়াছে যে, দুরন্ত আল্লাদকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্যুতের মতো উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলো পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সন্নেহে মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুম্বন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কী?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কিছুই না।"

এমন সময়ে বসন্ত রায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও।" আনন্দে গদগদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আল্লাদ হয় তো ভালো করেই হাস না ভাই, দেখি।

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,

হাসির সে প্রাণের সাধ ও অধরে খেলা করে।

বয়স যদি না যাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায় হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে। যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।"

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে?" তিনি কহিলেন, "আমি কী জানি।" "আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে?" নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, "অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।" তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, "নহবত বসিবে না কি?" "সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।" আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চাকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্কুলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?" ভালোমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, "না, ওটা হাতি।"

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, "তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে, সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।"

দেওয়ান কহিলেন, "বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে!

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?"

রমাই ভাঁড় কহিল, "বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে? তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই--"

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল "দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। আমার মা-ঠাকরুনের কথা অমন করিয়া বলিয়ো না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, "অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে-- ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।"

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, ওই বামনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ্য হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুই থাম্।"

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্মৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "এস, ভালো আছ তো?"

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "ভাঙামাখি পরগনার তহসিলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ?"

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই?"

রামচন্দ্র। আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জলবৃদ্ধি--

প্রতাপাদিত্য। মন্ত্রী এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে।

বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, "যাও বাপু, অন্তঃপুরে যাও।"

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।

### নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম" তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোনো আবশ্যক না থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন "মা" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল, "মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?"

রামমোহন কহিল, "তা মা, "কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়", তুমি কোন্ আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, "মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি, কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।" তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না।"

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, "না মা, অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।"

বিভা কহিল, "মোহন, তুই ব'স্; তোদের গল্প আমায় বল।"

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিতো লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিতো শুনিতো তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাঁধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধ মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চুড়ায় উঠিয়াছিল ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, "মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।"

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, "মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।"

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।"

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।" রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল,

"সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,  
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।

এলি কি পাষাণী ওরে  
দেখব তোরে আঁখি ভরে

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।"

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। হৃলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মৃণাল-বাহুর



কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুররমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মাগো মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা ঝাঁটা।" ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, "আর মাগি, তোর মুখটা আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।" বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও একপার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই প্রৌঢ়া মহিষীর কাছে আসিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এই যে নিকষা জননী।" শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শাদুলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি।" বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।" বলিয়া তাহাকে দুই-এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "রামমোহন তুই করিস কী?" রমাই কাতর স্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।" চারিদিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

রমাই কহিল, "মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" রামমোহন বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব।" বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আতঁনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্ত্রার মতন করিয়া ঝুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "লছমন সর্দারকে ডাকো।" লছমন সর্দারকে কহিলেন, "আজ রাতে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।" সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, "যো হুকুম মহারাজ।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল, "মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না।" প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আজ রাত্রে মধ্যাহ্নে আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।" তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন, মহারাজ, মার্জনা করুন।" তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "লছমন, শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।" শ্যালক দেখিলেন, তিনি যতদূর মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাতে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তব্ধ রাতে সেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয্যায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে-- তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, "তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?" এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক-একবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে-- প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোন্মিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, কাঁদিতেছ?"

বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কে ও?" বাহির হইতে উত্তর আসিল, "অবিলম্বে দ্বার খোলো।"

### দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় শয়নকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, "বাবা, এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।"

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন, কী হইয়াছে?"

"কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।"

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কী হইয়াছে?"

রমাপতি কহিলেন, "সে-কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।"

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, "মামা, কী হইয়াছে বলো।"

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পালাইবার উপায় দেখো।"

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।"

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোল করিস নে বিভা চুপ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন-- কহিলেন, "চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।" বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন, "এখন আমি কী উপায় করিব? পালাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।"

রমাপতি কহিলেন, "আজ রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, "মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।"

রমাপতি কহিলেন, "বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া

আসি।"

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, "মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো। আমি একবার দাদার কাছে যাই।" বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অন্তঃপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশব্দভাবে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেঁষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ওই যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে তো কেহ মুখ গুঁজিয়া, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নিচে, অথবা দেয়ালের এক পাশে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? আস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে এক জন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল-- কে এক জন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া ডাকিলেন, "মামা।" মামা কহিলেন, "কী বাবা?" রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে, বিভা?" বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য সম্মুখে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "কেন বিভা, কী হইয়াছে?" বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবো।"

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, হইয়াছে কী?" রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন। উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি এখনই পিতার কাছে যাই--তাহাকে কোনোমতেই আমি ও-কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।"

সুরমা কহিল, "তাহাতে কি কোনো ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।"

যুবরাজ কহিলেন, "আচ্ছা।"

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

"কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে,

দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।"

উদয়াদিত্য বলিলেন, "দাদামহাশয়, বিপদ ঘটয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অঁ্যা। সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।"

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না দাদা না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।"

বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা প্রতাপ, এ কি কখনো সম্ভব?" প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই-- তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। এক বার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনা উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, ইহা কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন সম্ভব নয়?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই! ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ মূর্থ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রপ করিবার জন্য আনিয়াছে,--এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সে-বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না। দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।" যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বুঝে না।"

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরে রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।"

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-এক জন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ এক জনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।) কিন্তু ভাবিয়া দেখো প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন--" বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।"

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ

হইয়াছে। নিচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, "এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।" সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা, তুমি এখানে থাক্, তুমি আসিস নে।" বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, "না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।" সেই নিম্নরুক্ত রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারিদিক হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দাদা, নিচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই। সেইখানে চলো।" সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।" উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, "প্রতাপাদিত্য যে-রকম লোক দেখিতেছি তিনি কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু

করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।"

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যাও।"

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জোড়হস্তে কহিল, "মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, "কেন মা, আমি কী করিয়াছি?" তাহার উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, "দাদা এখনো ফিরিল না, কী হইবে?"

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিধাতা যাহা করেন।"

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতে ছিলেন। কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার চৈতন্য হইতেছে যে, শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারী হস্তে অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন-- কহিলেন, "কে আছিস?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞা, আমি সীতারাম।"

যুবরাজ মৃদুস্বরে কহিলেন, "শীঘ্র দ্বার খোলো।"



সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নেই।"

যুবরাজ কহিলেন, "সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে? আচ্ছা তবে এস।" বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিলেন, "না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, "তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।"

সীতারাম কহিল, "যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।"

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক জন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যুদ্বেকে সে নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপাদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, "যুবরাজ, করেন কী?"

যুবরাজ কহিলেন, "অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।"

প্রহরী কহিল, "কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদেরকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।"

উদয়াদিত্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহারাদি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ, ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কী? যুবরাজ?" যুবরাজ কহিলেন, "বাহিরে এস।" রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, "দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ, আমাদের

মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া এক-শ জন লোক ভাগাইতে পারি।"

যুবরাজ কহিলেন, "সে-কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোনো উপায় দেখিতে হইবে।"

রামমোহন কহিল, "আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।" তখন অন্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "তোকে আমি এখনি ছাড়াইয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে, মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।" বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "রামমোহন, কী উপায় করিলে?" রামমোহন কহিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।"

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ও উপায় কোনো কাজের নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?"

রামমোহন কহিলেন, "রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "চলো একবার ছাদে যাই।"

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল-- সে কহিল, "হাঁ, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।"

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ ইহতে প্রায় সত্তর হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষটি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেইখানে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না না, সে কি হয়? রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।"

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "না রামমোহন, তাহা হইবে না।"

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলো খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড

রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।" রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, "জয় মা কালী।" রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, "মা, তবে আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোনো ভয় করিযো না।"

রামমোহন রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুঁজিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই হস্তে ঝুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও লাফাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মুর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, কী হইল?" উদয়াদিত্য মুর্ছিত বিভাকে সম্মুখে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "এখন তোমার কী হইবে?" উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার জন্য আমি ভাবি না।"

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বদ্ধ! এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পলাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না। এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। "ওরে বারুদ কোথায়--গুলি কোথায়" করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অনুসরণ করিবার জন্য একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মুদির দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আস্থানকারীকে সুদীর্ঘ ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, "আমি তো আর ঘোড়া নই।" একে একে সকলের যখন ভৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌঁছিল তখন ফর্নান্ডিজ এক তোপের

আওয়াজ করিল। প্রত্যুষে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, "প্রহরী।" কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাত্রেই পালাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।"

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।" যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্রোণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, "মন্ত্রী।" একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

"মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল?"

মন্ত্রী কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে।" মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথা স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "অন্তঃপুরের প্রহরীরা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাতপা-বাঁধা পড়িয়া আছে।"

মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে-সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্ত রায় কোথায়?"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বোধ করি তাঁহারা অন্তঃপুরেই আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, "এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান।" বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃকপাত করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন, "ইহাকে লইয়া আয়।" মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই।

প্রতাপাদিত্যের বজ্র এক জন না এক জনের উপরে পড়িবেই-- তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হাস্যরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দারুণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?" প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইল, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেননা ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, রাজজামাতা--"

প্রতাপাদিত্য অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র রায়--"

মন্ত্রী কহিলেন, "হাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?"

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অন্তঃপুরে প্রহরীদের এখনই ডাকিয়া লইয়া এস।" মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য এক জন কে-- অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল-- বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ-হৃদয় বসন্ত রায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন-- এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, "দাদা।" উদয়াদিত্য কহিতেছেন, "কী দাদামহাশয়?" তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ওই এক "দাদা" সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থই-- এ

কী? চারিদিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার জন্যই কি এ-সমস্ত হইল?" তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না দাদামহাশয়।" অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?" বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "সুরমা, ও সুরমা।" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাতপা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, "দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।"

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, "ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।" সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, "এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।"

বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব?" বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, "না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।"

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।"

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলা মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া?"

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।"

মহারাজ ঙ্গকুণ্ডিত করিয়া কহিলেন, "সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ্ঞা না, বলি মহারাজ, যুবরাজ-- যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।" যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ওই নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ওই নামটাই সর্বাগ্রে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে, "যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম, তিনি শুনিলেন না।"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর 'পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে তোর দোষ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা না।"

"তবে কার দোষ?"

"আজ্ঞা মহারাজ--"

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় চারিদিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে "দুর্গা" "দুর্গা" কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগস্ত্রীর স্বরে কহিলেন, "উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই!" এমনভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের সে অপরাধ বসন্ত রায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্মুখে রাখিয়াই ভর্ৎসনা করিতেছেন। বসন্ত রায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়ের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, "দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?"

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।"

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, "ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।" আর-একটি



কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, "বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।" বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "কেন, দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি এক-রকম কাটাইয়া দিব।"

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি বাঁচিব না।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ওই হাত বুলাইয়া দে।" বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, "সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায়?"

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "সে যম পারে, আর কেহ পারে না।"

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, "আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।"

সুরমা আবার কহিল, "আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।"

সুরমা ওই কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ওই কথা বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।"

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গল্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী করিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোটো রত্নের মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, "আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।"

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন,

"ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই,  
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।  
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,  
(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।  
খেলতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,  
হেথা হতে আয় রে সেরে, নইলে তোর মারবে ঢেলা,  
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল রে সোজা,  
(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "দেখো ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যক। এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই, বিভার কান্না দেখিতে পারি না।" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

"আমার যাবার সময় হল,  
আমায় কেন রাখিস ধরে,

চোখের জলের বাঁধন দিয়ে  
বাঁধিস নে আর মায়াডোরে।  
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,  
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,  
নাম ধরে আর ডাকসি নে ভাই,  
যেতে হবে ছুরা করে।"

"ওই দেখো, ওই দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ্ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো--" বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সমালাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ওই দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ওই দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ওই কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিসফিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।"

বসন্ত রায় দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, "এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো। বিভা--" কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, "আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। "তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-এক জন কার 'পরে তার মন

গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি-- তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?"

মঙ্গলার নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়। যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহে নহে স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "সে মাগীর মরিবার জন্য বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।" মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার মতন রূপসীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতিনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিযো, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।" বলিয়া এক শুকনো শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি রাজবাটীর খবর কী?"

মাতঙ্গিনী হাত উল্টাইয়া কহিল, "সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?"

মঙ্গলা কহিল, "ঠিক কথা। ঠিক কথা।"

মঙ্গলার যে এ-বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, "তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।" বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল, "তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।"

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, "তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

মঙ্গলা কহিল, "সত্যি নাকি? বটে। কেন বলো দেখি? তাই বলি, মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।"

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "আসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষু কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি-- না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।"

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামলাইতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব

সহিল না, কহিল, "এখানে কোনো লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন?"

"তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনাত্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ওই দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।"

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার যথার্থ কারণ রাজবাটীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, "তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ কথা।"

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন?"

"সে কথায় কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে 'তু' বলিয়া ডাকিলেই আসেন।"

"আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাঁহার কাছেই থাকেন?"

"হাঁ।"

মঙ্গলা কহিল, "ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস?"

"না ভাই, তাহা দেখি নাই।"

"আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।"

মাতঙ্গ কহিল, "কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

মঙ্গলা কহিল, "বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।"

মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ, আজ তবে আসি।" বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্তনহীন অবিচলিত পাষণহৃদয় রাজবাটীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলা ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া

স্নেহের স্বরে কহিল, "কী দেখিতেছিস বিভা?" বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কে জানে ভাই।" বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাড়ীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যে গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল; তাহার-- চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়তো রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহারা না জানি কোথায়। বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধুমায়িত হইতেছে সে-বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য শুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্যবশত রাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কিনা, সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে ঋণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আর কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে

শখটিও বজায় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্যদশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ-কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, "আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?"

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।"

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।" হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "কিন্তু এমন কী অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কী করিয়া দেখিব, আমার



জন্য আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহ্বারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।"

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পরে আস্তে আস্তে কহিলেন, "তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।" প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই "আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আত্মপরাধী কাহার প্রাণে সয়!"

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, "সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহার সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায়?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিশেষত রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিয়ো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, যাহাতে এ-কাজটা সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপরে ভার দাও।" সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে, সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে

প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ-কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, "তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব?" সুরমা বিভার চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্বস্ব এখানে রহিয়াছে।" সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখানে হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।" শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলো তাঁহার মতে নিতান্ত দুর্জ্জ্বেয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।" মহিষী কহিলেন, "তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে?" প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।"

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।" উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজাই জানেন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভঁসনা সহিয়াছে, "দূর ছাই" সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না! তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে? তাহা হইলে মা, আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।"

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা! ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।"

উদয়াদিত্য এ-কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, "মহারাজ রক্ষা করো। সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ওই সুরমা ওই ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।" বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, "পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই আমার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে-- সে রাজার ছেলে তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?"

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।"

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।" বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রাপ্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, "আর হইবে না।" আর আসিতে পাইব না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল,-- যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে

হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও একমুহূর্তের জন্যও একবিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ। সুরমার বুক ফাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই। তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, "ওই মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বলাইয়া দিবে, তুমি ওই দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?" সুরমা যে বলিল "কোথায়", তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর-দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরও কত দূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয়, তখন আরও কত দূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও একমুহূর্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন--তখন ওই পা দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকারলোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাতধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ডা, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, থরথর করিয়া কাঁপে, গলিত লৌহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত

দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানা অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনও তো কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা- নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে, তখন তিনি ভাবিলেন, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাহিতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিস্তরঙ্গ গভীর রাত্রে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিগ্রাম একঘেয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরও কিছুদিন রাজবাটীতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারিদিকে অকূল পাথার দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো যে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারিদিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার

মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম", বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যুষে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা- কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন, নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক আর বিলম্ব নাই!"

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, "এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, "সুরমা।" সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কী নাথ।" উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, সুরমা, তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?" সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বলাইয়া গেল, রাজবাটীতে পূজার শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।"

ক্রমে রাজবাটীতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?" সুরমা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া কহিলেন, "মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?" তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন "শেষ হইয়া গেছে!" "দাদা, কী হইল গো" বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে

পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ-- ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল-- সে-ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারিদিকে দেখিতেন, দেখিতেন-- কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন-- আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে-- মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিত পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারিদিকে দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন-- কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজকাল আর সে-সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব-- সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল?

তাকে এখন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল্?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে-- সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ-পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষি করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও।" মহারাজ রাগ করিলেন, কহিলেন "ওই এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুরবাড়ি না গেল দশজনে কী বলবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক-এক সময় কী যে করেন তাহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা



তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিয়াছিলেন-- অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েক জন বালক মাটির টিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীৰু দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিত পায় ও তাহা লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শক্রপক্ষের একজন সে-কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন, কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা, জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাঁহাকে টিকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা তো দুই পুরুষে রাজা! প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাত-সাপ চিনি না?" রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তৃণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটা করাতে দোদগ্ধপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, "আচ্ছা যা, এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।"

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, "আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত!"

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "বটে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহরনিদ্রা নাই।"

রাজা কহিলেন, "সত্য নাকি।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, "আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর!"

রমাই কহিল, "তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাকৈ পা দিয়াছেন, সে তো পাকৈর বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী!"

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি এক জন লঘুহৃদয়, সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন, উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও

তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্যপরিহাসের ঝুটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনও বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন-- কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুষন করিবার জন্য একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধনিমীলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুষন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস, সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষা-কাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে! সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে! তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল? স্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কই? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাকে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ।"

রাজা কহিলেন, "কী রামমোহন।"

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।

রাজা কহিলেন, "সে কী কথা!"

রামমোহন কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন তুমি পাগল হইয়াছ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি?"

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপরাধ করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "বল কী রামমোহন। প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?"

রামমোহন কহিল, "কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার--আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?"

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কী বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড়ো প্রতাপাদিত্য হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু-- দেখো, এ-কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীরা কানে যেন এ-কথা না উঠে।"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

### বিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ক্রটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে-- কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা জোগায় না। দুইজনে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, "দাদা, সে কোথায় গেল?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয় বিভা একটা গল্প বলি শোন।"

বর্ষার দিন খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলো স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই--সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, "সুরমা কোথায়!" বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, "দাদা।" দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, "দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও'সে।" উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, "দাদা উঠ, রাত হইল।" উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না। উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন!

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বেকার সাহস নাই। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিক দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল, "যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।"

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন, রাজকর্মচারী এক প্রজাকে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ"। যুবরাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে! তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনে, তখনই মনে করেন, "আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিবা।" তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনও যদি প্রতাপাদিত্য দ্রুতগতি করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনও তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রূপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রূপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখো, দিব্য নিশ্চিত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অল্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।" সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলো কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনরারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে ঘেঁষিয়া কহিল--

"ভিক্ষা যদি দিবে রাই,  
(আমার) সোনা রূপায় কাজ নাই,  
(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,  
মান রতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান রতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা রূপা পাইলে কাজে লাগে।"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "নাঃ-- আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না।" জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উথলিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে

থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর-সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অনুরাগ সহসা উথলিয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘোঁষিয়া প্রীতিভরে কহিল, "তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ!"

রুক্মিণী কহিল, "মর্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!"

সীতারাম কহিল, "তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, "না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, "দূর মূর্খ।"

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, "মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ।" সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জোগাইয়াছে।

আবার কহিল, "আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো।"

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, "বলো প্রাণ।"

সীতারাম কহিল, "প্রাণ।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল, "প্রিয়ে।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রিয়তমে।"

সীতারাম কহিল, "প্রিয়তমে।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রাণপ্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল, "প্রাণপ্রিয়ে। আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে?"



রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "যাও, যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?"

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমো।"

সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, "আমার ভাই অত ফন্দী আসে না, এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারিদিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া "কাকা" "কাকা" বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা, কাকীমা কোথায়?"

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "একবার তাঁহাকে ডাক্ না।" মেয়েটি "কাকীমা" "কাকীমা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ওই যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ওই যেন কে বলিয়া উঠিল, "এই যাই রে।" যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়দুড় করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের

মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "সুরমা কি?" পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, "কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।"

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?" উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, "আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?"

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেঁটন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল-- সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, "তোমার কী চাই?"

রুক্মিণী কহিল, "আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ওই বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না!"

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বিছানায় বসিয়ো না, বসিয়ো না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, "না, ও বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।"

রুক্মিণী কহিল, "আচ্ছা তোমার আঙুলের ওই আংটিটি দাও।"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুষ্টিগী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মল্লমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মল্ল খাটিবে। রুষ্টিগী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায়, সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

### দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে, ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে?"

ভাগবত কহিল, "ভালো না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বলো দেখি?"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, "বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল, "বটে? তা কেমন করিয়া হইল?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি? আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কী দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্বে কহিল, "তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই!"

সীতারাম কহিল, "সেজন্যে দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, "দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।"

ভাগবত কহিল, "কই তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না!" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, "না ভাই, কথার কথা বলিতেছি! আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।"

ভাগবত কহিল, "তা রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।"

সীতারাম করিল, "আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই? তুমি বড়ো-মানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।"

সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনোই না কেন?" বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।"

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন দাদা, বলি নাই!"

ভাগবত কহিল, "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর

মুদ্রিত থাকিবে। রুক্ষিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাক্ষিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমতো কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, "উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।" ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বীর রাজবাড়িতে চাকরি হইল।

### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ-সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিভা কাঁদিয়া, বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কী অপরাধ করিয়াছি?" দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার করিয়া কহিল, "আমি কী করিয়াছি? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছটফট করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।" এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বড়োয়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো জয় হোক" বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।"

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না-- বলে  
বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি  
অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ।  
এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল  
না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল-- শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া  
জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না। বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর  
পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ  
অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, "এতদিন পরে কি আমাকে মনে  
পড়িল?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, "এ  
কী অলক্ষণ। মা লক্ষ্মী, তুমি হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভদিনে  
চোখের জল মোছো।"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে।  
রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি  
রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে  
রামমোহনকে আহ্বার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন  
কাটিল। কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল।  
প্রতাপাদিত্য এ-বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের  
কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কী একটা ভাবিতেছিল।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই  
চলিলি? তা ভালোই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা  
হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক।"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের  
চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, "কেন  
কাঁদিতেছিস? এখানে তোর কী সুখ ছিল বিভা, চারি দিকে কেবল দুঃখ কষ্ট  
শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি-- তুই বাঁচিলি।"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতেছিস? তবে আয়।  
স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস নে। এক-একবার মনে  
করিস, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, "এখন আমি যাইতে পারিব না।"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কী কথা মা।"

বিভা কহিল, "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা  
ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ আর আমি

আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, "না মা, আমি পারিব না।"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথায় থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাস্বাস রামমোহন আসিয়া স্নানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব।"

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, "তবে বিদায় হই মা।" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, "মোহন।"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কী মা?"

বিভা কহিল, "মহারাজকে বলিও, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।"

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, "যে আজ্ঞা।"

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। স্নান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়; যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে, "বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন?" বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়, প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও-কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ-কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।"

### চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারটি খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনোপ্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল, রামমোহন?"

রামমোহন কহিল, "সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলি না?"

রামমোহন। আজ্ঞা, না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম।

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ--"

রামমোহন কপালে হাত দিয়া স্তানমুখে কহিল, "মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে কখনো হয় নাই।"

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, "ও-কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে



তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিল। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।"

রাজা কহিলেন, "তবে হইল না কেন?"

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, শীঘ্র বল!"

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ--

রাজা কহিলেন, "কী বল।"

রামমোহন। মহারাজ, মা-ঠাকরুন আসিতে চাহিলেন না।

বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ-- "মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।" কী জানি কী মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"আসিতে চাহিলেন না, বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সম্মুখ হইতে এখনই বেরো।"

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কী করিয়া ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল, "আমাদের মহারাজার অপমান!" অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর-একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

এক দিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।"

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ রমাই।" রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সঙ্কম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সঙ্কম কাহাকে বলে ও কী করিয়া সঙ্কম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, "মন্ত্রীমহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।" বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একখাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রঙা পাঠাইয়া দিবেন।"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্নাণ্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ-- যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে তো যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক হইয়া চাহিল, এমন কি, একজন অমাত্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়। রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

জানালাৰ কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বৰ্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তন্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই-একজন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূৰ্বদিক হইতে কাৰাগারের হুৎস্পন্দন-ধ্বনির মতো প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শোনা যাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে-রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানালাৰ কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারিদিকে দাসদাসী, চারিদিকেই পিসি মাসি, কথায় কথায় "কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত" জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রুবিन्दুর হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীৰ্ঘনিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই। ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূৰ্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অন্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীৰ্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তন্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীৰু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আঁধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হইতে শান্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারে সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারিদিকে কিছুই নাই। আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপর কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন

বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিষ্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগ্দিগন্তশূন্য মহাঅন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারি দিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হু হু।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখিরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই-একটি রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ কী বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ কী, আমি কোথায়?" মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ! বিভা, তুই আসিয়াছিস? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।"

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানালায় ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাথে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারি দিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে এক দিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।"

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। সেদিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারাপ্রবেশের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এতদিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিতে, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণ-কিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতর একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি তো ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা

সুকুমার বিভাকে আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন, "তুই যা বিভা।" কিন্তু বিভা উষার বাতাস লইয়া উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, "বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না।" প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, "বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই স্বশুরবাড়ি যা। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব।"

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, "আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব।"

### ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন। আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।" রামমোহন জোড়হস্তে কহিল,

"আজ্ঞা না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।" রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। একদিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর-একদিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্না মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন-- কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে সুকুমার বিভা বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকুল পাথার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বলো দেখি?"

মহিষী কহিলেন, "নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে তবে বিভাকে তো এক সময়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।"

প্রতাপাদিত্য। "সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?"

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, "ওই তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়--"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হইবে আর কী?"

মহিষী। "এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।" বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে-- তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে!"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কী হইবে। আমার পাষণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যন্ত্রণা দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে-- আমার বাছাকে-- রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ। সে আমার কাহারও কোনো অপরাধ করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকার্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন, তাহার দোষ কী।" বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও-কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে-কথা হইতেছিল তাহাই বলো না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমারই পোড়া কপাল! বলিব আর কী? বলিলে কি তুমি কিছু শোন? একবার বিভার মুখপানে চাও, মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না-- সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

### সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই তো সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি। কহিল, "সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বলাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপর ঘষিব, তোর মুখে চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।"

রুক্মিণী ক্রিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ দ্রুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিষ্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্কুল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন দ্রু তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষু বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাঙ্গস্বর্গীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক হইল, কুঞ্চিত দ্রু প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া



পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে-- যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।"

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন--

আমিই শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি

আমার ব'লে ছিল যারা

আর তো তারা দেয় না সাড়া,

কোথায় তারা, কোথায় তারা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।

বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,

আমার কিছু রাখলি নে রে?

আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, "গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত, তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ওই তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হয়--"

এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিতেছে-- আমিই শুধু রইনু বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, এসো এসো।" অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভালো আছে তো?"

খাঁ সাহেব। "মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে-- রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ,

তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই!-- মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।"

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব। "মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না।" বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব?"

আমি শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে,

রইল যা তা কেবল ফাঁকি।"

খাঁ সাহেব। "আপনি আর সে সেতার বাজান কই? আপনার সে সেতার কোথায়?"

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে সেতার যে নাই, তাহা নয়। সেতার আছে শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।" বলিয়া আশ্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, একটা গান গাও না-- একটা গান গাও; গাও, তাজবে তাজ নওবে নও।"

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন,

তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন-- তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? দাদা কেমন আছে? দিদি কোথায়? খবর ভালো তো?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে-কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে-কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাহার দ্রুত উর্ধ্বে উঠিল, তাহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাহার

অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল-- নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অঁ্যা?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। "মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?"

সীতারাম। "আজ্ঞা, তিনি কারাগারে।"

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ-কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। "আজ্ঞা মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?"

সীতারাম। "কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।"

বসন্ত রায়। "তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?"

সীতারাম। "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?"

সীতারাম। "আজ্ঞা না।"

বসন্ত রায়। "সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে?"

বসন্ত রায় এ-কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই-- আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই-- সে উত্তর করিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।"

### অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ-- খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একাগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" তাই তিনি অতি একাগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না; তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া

গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেইসব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে। সে এক কী উৎসবের দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান শুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা-- সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে-ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিত-- সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়-- দাদামহাশয়কে দেখিলেই সে- ঘরটা যেন এখনই কাঁদিয়া উঠিবে। বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন-- দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিকে দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুকফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?"

বিভা কাঁদিয়া কহিল, "না দাদামহাশয়, কেহই নাই।"

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই।"

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন,

আমি শুধু রইনু বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও-- সে তোমার কী করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমার কাছে অপরাধ করে তবে তাহাকে এই বুড়োর কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই-- আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাকে দেখিতে হইবে না-- সে আমার কাছে থাকিবে!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া চুপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, "খুড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ-বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন-- অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, একদিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্ দেখি, আমি তোর কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে

তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী-- তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাই না, কখনো চাইও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি-- তাও দিবি না?"

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে আমার কথা শুনিবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না? কথায় উত্তর দিবি নে প্রতাপ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে এই অনুমতি দাও।"

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরও বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্ত রায় নিতান্ত ম্লানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, আমার ঘরে এস।" বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, এস, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।" বসন্ত রায় কহিলেন, "দিদি সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।"

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আয় বিভা আয়; গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল। এখন আর একটা মাথার অনুসন্ধান কর, আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, "রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, "মা, আয়ুস্বতী হও।"

মহিষী কহিলেন, "কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।"

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "রাম, রাম। ও-কথা মুখে আনিতেন নাই।"

মহিষী কহিলেন, "আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্না যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, "বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।"

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

"এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।" বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার কিসের সুখ আছে? উদয়-- বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ-- সে যেন রাজার মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।" মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ওই কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।

চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা!"

মহিষী কহিলেন, "মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না, বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার স্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিয়ো না!"

মহিষী কহিলেন, "আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন। বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।" বসন্ত রায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন, "বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া যাও যে, বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।"

### উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী সীতারাম, কী খবর?"

সীতারাম কহিল, "সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন, কোথায় সীতারাম?"

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল। বসন্ত রায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "সত্য নাকি?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখনই যাইতে হইবে নাকি?"

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?

সীতারাম। আজ্ঞা না, আর সময় নাই।

বসন্ত রায়। কোথায় যাইতে হইবে?

সীতারাম। আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?"

সীতারাম। আজ্ঞা না মহারাজ। দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বসন্ত রায়। তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে কাজ নাই-- কাজ নাই।" উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, "একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না।?"

সীতারাম। না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।

"দুর্গা বলো" বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পরে বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক- এক বার দীপ নিবো-নিবো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল-- দীপ নিবিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া



বসিলেন। একে একে কত কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরি করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তুষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখখানি ভাবিতেছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, "বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষণ্ণ অন্ধকার মূর্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা তাহার সংসার-পথের কন্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন বিভা আসিবে-- বিকাল হইল, সন্ধ্যা হইল-- রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না।-- তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।" উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা হা হা করিতে লাগিল-- তাঁহার কল্পনারাজ্যের চারিদিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কন্টক বলিয়া দেখিবে সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, "আমি কী ভয়ানক স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি, কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।" বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে সে বল চালিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকুল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন-- মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাল্পনিক মূর্তিকে আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময়ে বহির্দেশে সহসা "আগুন-- আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল, বাহিরে শত শত কণ্ঠরোল একত্রে উঠিল, সহসা নানা কণ্ঠে নানাবিধ চীৎকার সহিত আকাশে শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল-- তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল-- তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

সে উত্তর করিল, "আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন?"

সীতারাম কহিল, "যুবরাজ, কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া-- প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেকদিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন-- মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব, কোথায় যাইব?" অনেকদিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই-- আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব? কোথায় যাইব?"

সীতারাম কহিল, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল-- সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল, সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত-পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-এক জন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াকড় পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শান্তভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আগুন নেবে না-- কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সে কী একটা বলিতে চায়। কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, "যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মাগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।" বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ড হইয়া

উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, "পোড়ামুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।"

"ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?" বলিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল। যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটো জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুলগুলো ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

### ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দাদা আসিয়াছিস?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন-- সেই চিরপরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে যে স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন-- সেই স্বর। বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয়ে সেইখানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়।" বসন্ত রায় কহিলেন, "কী দাদা।" আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কী অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, "যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।"

যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, "কেন, নৌকায় কেন?"

সীতারাম কহিল, "নহিলে এখনই আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ যে পাষণ-হৃদয়ের দেশ-- এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি যাই-- একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।"

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার কথা শোন-- সেখানে যাস নে, সে-চেষ্টা করা নিষ্ফল।"

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে যাই। আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।"

বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সেকি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে চলো চলো দাদামহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।"

সীতারাম কহিল, "নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।"

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, "মা, আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা-- আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।" বিভাকে লিখিলেন, "চিরায়ুশ্মতীষু-- তোমাকে আর কী লিখিব-- তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো-- স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন-- এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া

বলিয়া উঠিল, "ওই রে-- সেই ডাকনী আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদ্গার করিতেছে-- তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে-- একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল-- সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাস্থে হল ফুটাইতে থাকে, তেমনই সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছুই হইল না, কিছুই হইল না-- এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুদ্বিগ্ধে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল-- কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন-- বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, "যাত্রার সময় কী অমঙ্গল।"

### একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভূত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীর্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চৌকাঠ কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে কোনো সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সেদিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমতো ধরিয়াছে। কতকগুলো হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনো প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরীশালার আগুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "ও কী রো!" একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে।" প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তো তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।" যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে-- চারিদিকে আগুন-- ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবা। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটিরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শৌখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। মঙ্গলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ঢের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর- একজন লইবে-- তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুতেই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল-- কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হুটচিতে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার-- কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিঁদুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে। কাহার যেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে-- আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে, পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে-- ঘরে আর কিছু নাই-- কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী, সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাকে প্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না-- ভরসা বাঁধিয়া পিছন

ফিরিতেও পারিল না। সীতারাম নিতান্ত ভীৰু ছিল না, অলক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, "তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি।" রুক্মিণী কটমট করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল-- তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, "বটে। তোদের এখনও সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আগে তোকে আর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব-- তার পরে যমের সাধ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই।"

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল, "মাইরি ভাই, ওইজন্যই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয়, ভালো বুঝতে পারি না। বল্ তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?"

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল-- সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, "একটু রোসো; তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি।" বলিয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁটির অশেষে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল-- সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বাঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বাঁটিহস্তে শূন্যগৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে-- তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণশাণিত হাস্য নাই, বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই-- রাজবাটীর যে-সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে



আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আগুনও ক্রমে নিবিয়া গেল, যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দধি তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়া কোথায়?" রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল, "যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন।" কেহ কহিল, "না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য এইরূপ যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী চাও?" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি আর কিছু চাই না-- তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, "চুপ কর মিন্সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমারা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বলো।"

রুক্মিণী কহিল, "বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে!"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুक्মিণী কহিল, "আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে?" রুक्মিণী কহিল, "সে-কথায় কাজ কী গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া, উহারা এ-কাজ করিবে না।"

প্রতাপাদিত্য রুक्মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ।" মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুक्মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

### দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন। প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে

গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরজিতভাবে কহিলেন, "আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্তা হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্য মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্বাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত "তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?" উল্টিয়া পাল্টিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভাল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন-- তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রসারিত, নির্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো স্নেহের মেয়েটির মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদার করে, তাহার মায়ের

গৃহকার্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিস্তব্ধ বিষণ্ণ ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে-- এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহার সর্বাস্থে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশ্বস্তভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু এক তিল মলিন করিবেন। এইজন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্যমুখে অপরিতুষ্ট নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছুদিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা। একবার তিনি মার্জনা করিয়াছেন, আবার--। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, "মা।" ওই কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কী বাছা।" বিভা ক্রিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "মা, তুমি আমাকে কবে পাঠাইবি মা।" বলিতে বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় পাঠাইব বিড়ু।" বিভা মিনতিস্বরে কহিল, "বলো না মা।" মহিষী কহিলেন, "আর কিছুদিন সবুর করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল।

### ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পরে উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই।

"প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ-কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।  
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম  
জোর করে রাখিব ধরে।  
শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি  
তুমিই তবে থাকো সেথায়  
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বারবার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।"

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সংকীর্ণপ্রসর পাষণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাস্থে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তম্ভতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিমউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে"। বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে

যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, "প্রণাম করো।" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, "এখান হইতে যশোর যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।" শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।" বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন-- একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব-- এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব-- মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন-- যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?"

বসন্ত রায় অন্যদিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা নয় তো আর কী। কতদিন আর বাঁচিব বল, বুড়া হইয়াছি।"

গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই!"

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদামহাশয়।"

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়া তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা!"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, কোথায় যাস?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আজ নাই-বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর যাইব না দাদামহাশয়, এখনই ফিরিয়া আসিব।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?"

যুবরাজ কহিলেন, "না, আবশ্যক নাই।"

প্রহরী কহিল, "মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই!"

যুবরাজ কহিলেন, "অস্ত্রের প্রয়োজন কী?"

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই-- পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে কোথাও ঘরবাড়ি না বাঁধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে

কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল-- বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট খেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে-- যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল-- সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্ত রায় যখন শুনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখ করিয়া বলিবেন, "অ্যা, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল!" সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ-- এইখানে!"

দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এইদিকে তাকাও! একবার এইদিকে তাকাও!" যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "দূর হ মাগী।" সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, "এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি--।" যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?"

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, "জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ।"

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, "ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।" মুক্তিয়ার খাঁ হাত জোড় করিয়া কহিল, "এখনই ফিরিতে পারিব না।" যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, "কেন?" মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।"



যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, "কী আদেশ!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।"

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ দিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের-- আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো-- আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ! তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিয়ো।"

মুক্তিয়ার জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ, মার্জনা করুন তাহা পারিব না।" যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরাপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।"

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্রে তাহা বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিয়ো।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘোঁষিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের

প্রান্তে গিয়া সে সুর মিলাইয়া গেল। সৈন্যেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল। উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" এক জন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল-- শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কে গা।" উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।" দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আঁহিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটীতে কোনো কোলাহল নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আঁহিক করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিয়ো না। আমি এখনই আঁহিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আঁহিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, ভালো আছ তো?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আহারাদি হইয়াছে?"

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ

বসন্ত রায়। "আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।"

মুক্তিয়ার কহিল, "আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।"

বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছ তো?"

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নাই?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ? এখনই বলো।"

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি প্রতাপের লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ।"

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

তখন বসন্ত রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, "প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম-- এই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, "না জনাব, হুকুম নাই।"

বসন্ত রায় সাক্ষ্যে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, "একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!"

মুক্তিয়ার কহিল, "আমি আদেশপালক ভূত্য মাত্র।"

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন-- আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন কহিলেন, "প্রতাপকে বলিও, আমি তাহাকে

আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ-- দেখিয়ো অন্যায্য বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"

বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুঁজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ট হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "সাহেব এইবার।"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, "আবদুল।" আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

### চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্তির ন্যায় স্থির-- তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই-- কেবলই ভাবিতেছিলেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল-- দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে-- যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উষার বাতাস বহিল, পূর্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হু হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল-- হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল-- তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন।" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন, অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্য কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর

সকল কাজে বাধা দেয়-- নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর- সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীৰু, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল-- আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় হইলাম।"

উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল-- তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কী করিয়া জানিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব-- আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি তবে কী চাও?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা-- আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেইদিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, "মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি-- যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারানী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া

চল্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "মা তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।"

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, "বিভা,দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।"

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামহাশয় কেমন আছেন?"

"দাদামহাশয় ভালো আছেন।" বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

### পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, "বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে।"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তবে আর বিভা বাঁচিবে না।"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনও

শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, "বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।" রাজবাড়ির ভূতেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল-- জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ-বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেষ্টাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা উর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে চোখে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে-- বিভা ছোটো পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদু স্বরে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া, লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, "আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকিয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।" সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

### ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার 'পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, "কে ও? রামমোহন যে? আরে, এস এস।" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "মোহন।"

রামমোহন। মা।

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া স্নানমুখে কহিল, "মা তুমি আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, মোহন। মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুমি কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?"



রামমোহন কহিল, "না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক্, আর-একদিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, "কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।"

রামমোহন কহিল, "আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে-- আজ থাক্ মা।"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ মোহন, কী হইয়াছে?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল। রামমোহন কহিতে লাগিল, "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না!"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্তহৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, "মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন-- আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে?"

মোহন কহিল, "বিলম্ব হইয়াছে বই কি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল, "আর কি মার্জনা করিবেন না?"

মোহন কহিল, "মার্জনা আর করিলেন কই।"

বিভা কহিল, "মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, "আজ থাক্ না, মা।"

বিভা কহিল, "না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।"

রামমোহন কহিল, "যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।"

বিভা কহিল, "না মোহন, এখনই একবার যাই।"

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, "তবে একখানি শিবিকা আনাই।"

বিভা কহিল, "শিবিকা কেন? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায়

কাজ কী?"

রামমোহন কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।"

বিভা কাতর স্বরে কহিল, "মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।"

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, "আচ্ছা মা, তাহাই হউক।"

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভূত্যেরা আসিয়া কহিল, "এ কী মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও!"

রামমোহন কহিল, "এ তো মায়ের রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।"

ভূত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

### সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকোচে মারিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্ত যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি-- কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্যন্ত, চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্যন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহুর্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারিদিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে ফর্নাণ্ডিজ ছিল, যে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাসদাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ে কাছ ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? ভিখারিনী? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস?"

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনার মহিষী-- যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন, এখন

কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?"

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম। তোমার মহিষীকে-- আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল-- উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, "কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।"

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, "মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।" বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, "আয় মা, আয়। এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়। আর একমুহূর্তও এখানে থাকা নয়।" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে থাকিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে--

"বউঠাকুরাণীর হাট।"

গল্পগুচ্ছ

## পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গওগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহার ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়-- কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত-- যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিত্ত্বদয়েও ঈষৎ হ্রৎকম্প উপস্থিত হইত তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন "রতন"। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না-- বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে-- হেঁশেলের--

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন-- একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল-- বহু পূর্বকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল-- অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সঁকিয়া আনিত-- তাহাতেই উভয়ের রাত্রে আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন-- ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উথিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না-- সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত-- হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন

তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন"। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল-- হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া "স্বরে অ" "স্বরে আ" করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ-- নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন-- বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল "রতন"। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না-- দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন-- মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না; মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা



খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহ্বার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যিক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল-- "সে কী করে হবে।"

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়াদ্র হৃদয় হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন

অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।"

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"-- বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ বুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেন্টরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুশাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন-- একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, "ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি"- কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে- এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে-- সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।



## রামকানাইয়ের নিবুদ্ভিতা

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্তীর্ণ করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্চিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত-যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।"

এ দিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো!" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন- কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগ্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই-- এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নিজীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলো কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাকরোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল "মায়াকান্না"। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল-- বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে--"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন-- এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে-- কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমত আমাকে বলিও, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাণ্ণি কে করে-- এবং শ্রাদ্ধশাস্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ্ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিস্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত "রাম, আমি যদি ক্রিস্চান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই-চারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।--

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।-- তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেষ্টাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো-- আমি কেন বেঁচে রইলুম।" রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আমাদের কপালের দোষ।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়িসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন-- অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন "লেখো", ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই

কোন্ পোড়ামুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে-- আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন-কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি।" ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন-- অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল-- নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, "রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে

ক্ষুর"- যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিলা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা এ কি সর্বনাশ করিয়াছিস!" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সংকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন-- আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুইদিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন-- বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে

উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল-- আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।"

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বুদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্যের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"-- কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।



# খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিহ্নে ছিপ্ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুনসেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকুলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্তীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্তী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকুলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে থিল্ থিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সর্বিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার — এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া

সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন"। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিগ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুপ্ত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ওই দেখো পাখি ঐ উড়েএ

গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্খল্ ছল্ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাतीরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু খোকাবাবু লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্ছল্ খল্খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু" "খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানি নে মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমনকি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্রোষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সেকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না — যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, "তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল \_ আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।" তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্নতবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ক্রটি করিত না। মনে মনে বলিত, "বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।"

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হুঁপুট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ-- কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালোপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে-- তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়-- কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজন সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসাতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকুলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকুলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বন্ধের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্তী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাস্তনে শব্দ উঠিল "জয় হোক মা"।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকুলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ শ্রান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকুল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি--"

অনুকুল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশু আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকুলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ-- বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকুলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত এবং রাইচরণকে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদগদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্তী বলিলেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু।"

"তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এরূপ বৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, "পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।"

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুল্‌সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

## কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেকসময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমনসময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, 'বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?'

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। 'দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি ঝুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।'

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'বাবা, মা তোমার কে হয়।'

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, 'মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্গে যা। আমার এখন কাজ আছে।'

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে 'আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে হইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।'

ময়লা টিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, বুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল-- তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বাঙ্গাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই বুলিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।



কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানব-সন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল-- আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল।'

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম-- সে আমার গা ঘেষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যিকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতোছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো আঁসলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, 'উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।' বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।'

মিনি বলিতেছে, 'কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।'

তাহার মা বলিতেছেন, 'কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।'

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, 'আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।'

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুন্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে-- যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, 'কাবুলিওয়ালো, ও কাবুলিওয়ালো, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।'

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, 'হাঁতি।'

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সুক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সুক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ-একটু কৌতুক অনুভব করিত-- এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্ৰাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি ক'খু নু যাবে না!'

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আশ্ফালন করিয়া বলিত, 'হামি সসুরকে মারবে।'

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার

অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দক্ষ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাইকরা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক-- কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শূঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, 'কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।'

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই টিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি, মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুইতিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে-- মাথায়-

গলবন্ধ-জড়ানো উষাচরণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুইপাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে-- তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কঞ্চিৎ ধারিত-- মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি স্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত হাসিয়া কহিল, 'সিখানেই যাচ্ছে।'

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, 'সসুরাকে মারিতাম কিন্তু, কী করিব, হাত বাঁধা।'

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখ্যার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিত। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সেহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে।

কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাভ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, 'কী রে রহমত, কবে আসিলি।'

সে কহিল, 'কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।'

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, 'আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।'

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?'

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবার আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্মিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল-- তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, 'আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।'

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, 'এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্মিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।'

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, 'আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে-- আমাকে পয়সা দিবেন না।--

'বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।'

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত টিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে-- যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চয় করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম -- তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবেশিনী মিনি সলজ্জ ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা খতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?'

মিনি এখন স্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না-- রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে-- তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরু-পর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।'

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

## ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নুতন ভাবোদয় হইল, নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আশ্চালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ।'

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল-- সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারো মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল-- 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হুগু হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।



ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমনসময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ঐ হোথা।' কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারো বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা।'

সে বলিল, 'জানি নে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!'

ফটিক কহিল, 'না, মারি নি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস!'

'ক'খ'খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বস্তরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বস্তরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশাস্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বস্তর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, আমার সঙ্গে কলিকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিল বলিল, 'যাব।'

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল-- কোনদিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি সঁষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বস্তরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধে-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়।

এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনা অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত-- অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও।' -- তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বাঁ বাঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্থিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা-- কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোখুলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন-- সেই লজ্জিত শক্তিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি

ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।'

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল-- সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাতে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারো কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিনে আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বস্তরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বস্তরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিগ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বস্তর-বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাস্থে কাদা,

মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বস্তরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহালাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বস্তরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।'

বিশ্বস্তরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া স্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বস্তরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বস্তরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে--এ--এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকুল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্তর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিল, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে  
কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

# অতিথি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, 'কাঁঠালে।'

ব্রাহ্মণবালক কহিল, 'আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?'

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী?'

ব্রাহ্মণবালক কহিল, 'আমার নাম তারাপদ।'

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপসবালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাত্মক বহুলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যগ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, 'বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহালাদি হবে।'

তারাপদ বলিল, 'রোসুন।' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অল্পপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন--মনে মনে কহিলেন, 'আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে-- ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।'

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অল্পপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে

করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গৌ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহালাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার মা নাই?'

তারা পদ কহিল, 'আছেন।'

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?'

তারা পদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'কেন ভালোবাসবেন না?'

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, 'তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে।'

তারা পদ কহিল, 'তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।'

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।'

তারা পদের বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারা পদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না; মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুরগুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি, স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে; সে যখনই



দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বখগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁথারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথম সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ, যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাস্থে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাতে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বন্ধ-পিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিমন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিমন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলায় আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতুহলবশত এই জিমন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ

করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল-- জিমন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্যে ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাইতে হইত-- এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন-- শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতুহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অল্পপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরে অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার উর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন্-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল-- সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্ণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খेत, গাঢ় শ্যামল আমনধানের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি

দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই উর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহুদ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাঝ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমরবাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতুহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল--যখন সে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাত্রে তুমি কী খাও?'

তারাপদ কহিল, 'যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।'

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতুষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, 'আমার ভালো লাগে না।'

নদীর উপর দুই-তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতুলহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি

আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ--ভূতভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই--  
সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার  
মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না  
থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া  
যাইত। পাঁচালি কথকতা কীর্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার  
কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রীকন্যাকে  
রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে এমন সময়  
তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া  
আসিয়া কহিল, 'বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।'

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট  
পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্ৰবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল। দাঁড়ি মাঝি  
সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই  
নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল-- দুই নিস্তব্ধ  
তটভূমি কুতুহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের  
আরোহিণী ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন  
শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে  
শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্তর্পূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া  
বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই  
ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।  
কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের  
একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড়  
পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল; কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র  
স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত,  
পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ  
একবার চুল বাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া  
যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না,  
অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার  
এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি  
থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া  
ধরিয়া, চুম্বন করিয়া, হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র  
মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্রোহে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অল্পপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চারু, কেমন লাগল।' সে কোনো উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়-- কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অল্পপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অল্পপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অল্পপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষসরোদনে বলিত, 'মা, তোমারা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।' পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতুহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না। সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই-সকল নদীউপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনোরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিন-দশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাটুঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্ত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র; বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে; রাখালের সঙ্গে সে রাখাল, অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে। ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে 'দাদাঠাকুর, একটু বোসো তো ভাই, আমি আসছি'-- তারাপদ অল্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুণের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সে-ই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতুহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে-- যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ-- অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে, অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্রোহের জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন। -- বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মাস্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদের ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল, 'চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছে কেন!' চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে 'বেশ করছি' 'খুব করছি' বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটা তুলিয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতুহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর-একটি কৌতুহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলালবাবুদের লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত, কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বাহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, 'ইংরাজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।'

তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, 'শিখব।'

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্ট্রেন্সস্কুলের হেডমাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্বন্ধে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত-- কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ করিয়া বসিল, 'আমিও ইংরাজি শিখিব।' তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন; কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী



হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নুতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নুতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নুতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাশ্রয় সেকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ণমুখে বসিয়া ছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদের নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, 'আমি আর কখনো খাতায় কালী মাখাব না।' লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না-- হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদের সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সন্মুখে বলিত, 'কী সোনা! খবর কী। মাসি কেমন আছে।'

সোনামণি কহিত, 'অনেক দিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।'

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, 'অ্যা সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।' যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিবাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, 'সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।' চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, 'যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?'

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।' তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্ দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারো নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক

অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাঅ্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহ-বয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া ও বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি-একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অল্পপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, 'পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।'

শুনিয়া মতিবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, 'সেও কি কখনো হয়। তারাপদের কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।'

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপানা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক, শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদের দেশে তাহার কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো, কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অল্পপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপন

রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাস্যামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গুঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পক্ষিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি-চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল-- এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্বতীর মতো কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল-- উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটির-বাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল-- শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিন-যাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণজলরথে চড়িয়া এই গ্রাম্যকন্যাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া

উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যেৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সটের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে; যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে; পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে-- উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল-- পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল- নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা -- চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদের মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল, এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘাঙ্ককার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

## ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড়-চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেন না। তাহার অনেকগুলো কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?'

সুশীল বলিল, 'আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।'

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, 'পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।'

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আমার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।'

বাবা বলিলেন, 'না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক।' এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আমার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।'

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।' ছেলেকে গিয়া বলিলেন, 'কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।' শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত টিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আঙ্গিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাড্ব্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেক মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই-- পরিস্কার টাক তক্তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের

মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়াতাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতেই উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল; চাকরকে বলিল, 'ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজ্জুস কিনে আন।'

লজ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল 'এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক'; আমার তখনই মনে হইল 'না কাজ নাই, এত লজ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।'

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহার সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, 'চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।'

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া



বসিয়া কেবল বইলইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, 'বাবা, ইস্কুলে যাবে না?' সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, 'আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।' সুশীল রাগ করিয়া বলিত, 'পারবে না বৈকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।'

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃতিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘন্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়ো সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত-- সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাস্থের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলের বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায়ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও

কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোশ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্টন্ বন্বন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত-- বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়ামানুষেরা তাস পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে 'যা যা, খেলা কর্গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না' বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, 'দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।' শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, 'ওরে বেজা, ক দিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।' নাপিত ভাবিত ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, 'আর বছরদশেক বাদে আসব এখন।' আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, 'পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল!' অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।'

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, 'হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।'

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, 'কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?'

তাহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদেরই তাহাই করিয়া দাও।'

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।'

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, 'সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?'

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।'



## বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে-- আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিনী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে-- কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই-- তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পূবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল-বেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমার বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত-- সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত-- গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে-- ও কাউকে না বলে আস্তে

আস্বে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তন্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে-- এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে? তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকি পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়-- ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সবচেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে-- এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলুদে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা-- সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, 'ওই ঘাসিয়ারাকে বলো-না, আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে।'

কাকি বলে, 'বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।'

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই-- ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঞ্চস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার

জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে-- সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বত প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মুক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দু্যলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাভণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলাম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা, এ গাছটা কী।'

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, 'মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।'

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা! বললে, 'না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।'

আমি বললুম, 'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।'

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।'

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, 'ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।'

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের

মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব-চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে! আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, 'নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।'

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, 'আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে!'

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়-- তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে-- এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্নই দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, 'কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন।'

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, 'সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।'

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।



সে

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিনসন্ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ার দল দেশে দেশে।

নাতনির ফরমাসে কিছু দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপুত্রের গল্প অনেক শুনেছি; কখনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার শখ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্ড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা ঢেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শখ যায় আইসক্রিমের। এমন ক'রে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝামাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা--দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে খাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এইসব ঐকে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুতুর নয়--সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপটে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খটখটে রোদ্দুর। আদ্রেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট্ ক'রে খাটের থেকে লক্ষ্মীছিটির ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি, জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল।

সে শুরু করলে--

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,

নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদি হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে, এতে সে ভারি খুশি। যেমন খুশি হয় জগতের দোদগুপ্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! দুবেলা দু বাটি ক'রে দুধ খাও-- গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে নুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা-- সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশ-কাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মানুষ' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জ্বর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাক্করনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবল-ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে; ফির্তি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাস করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনোদিন দুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু সুধাকান্তবাবু শিখতে চায় মোচার ঘণ্ট তৈরি করা। আর-একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিন্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

ঐ-যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নাম নেই। আর রাজকন্যা, যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

ঐ-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটাস্, কেউ বলে প্রেস্কট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো?

কার গল্প। এ তো রাজপুত্রের নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'সে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে? তার পরে এই রকমই আরও কত কী--বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'ষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফৌজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প ব'লে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্টা যখনই বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিশ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তখনি শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু, ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি নে। তিনি সন্ন্যাসী-দত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতূহল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ ক'রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসে ছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্ক্রুপ দিয়ে ফুটো ক'রে সেইখানে রবারের ছিপি এঁটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর ক'রে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি-- দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।-- লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কানুনগরে, প্রশ্ণচিহ্নের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতাই এসে ঠেকবেন, এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ, চেহারা সুগম্ভীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ তাই কোনো ঠাট্টা-মস্করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

## ২

এর মধ্যে পুপুদিদি গেছে দার্জিলিং। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষমানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপুদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহনত সহাবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হুঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শূন্য দ্বীপে বসতি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো-- কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপসে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁচছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করছেন ডিবার মধ্যে?

না। পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তি-স্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান?

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়া সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হন্যে হয়ে উঠেছে-- তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তা হলে--

অল্প একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদযন্ত্র পাকযন্ত্র বুলে বুলে মরছে; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো বৎসর ধ'রে। তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আয়ুষ্কয় ক'রে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী; চতুষ্পদের কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায়?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মংলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন--সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস! আরও কিছু বাকি আছে বোধ হয়?

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রেতাযুগের হনুমান আজও আছে বেঁচে। আজ ওঁরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।-- কখনো টেকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা- চালানোর চালে, কখনো ঝোড়ো সুপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্যির জায়গাটা বদ্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হুঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে।

এতবড়ো নতুন মজাটা--

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সবুজ নস্যি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। ঐ হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী ক'রে। হয়তো কোন্ হামাগুড়ি-ওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মন্ত্বে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদী-গমন উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফাস্ট প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কারো না।



বেশি বোকো না। চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুবুদ্ধির জন্যে বলেছেন :  
তাবচ্চ বাঁচতে মূৰ্খ যাবৎ ন বক্বকায়তে। -- তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে?

যতটা শিখেছিলেম ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের  
হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ  
মিলিয়েই লেখা : তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।-- চললুম।  
আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো  
যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে  
বললে, এ কখনো হয়? নস্যি নিয়ে পেট ভরে?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বস্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি  
বাঁচা যায়।

আমি বললুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে  
দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে  
দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা?

আমি বললেম, তারা কথা ব'লে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের  
অসুখে, কেউ বা কাশিসর্দিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা ব'লে, কেউ বা মরে না ব'লে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হুঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল  
আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

৩

শিবাসোধানসমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির  
আসরে আজ সন্কেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

রিপোর্ট

সন্কেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে  
বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ  
করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুম পশু, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি,  
তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সংকার্য বটে।  
জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মংলব হল কেন।  
সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে,  
আমাকে পূজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো  
কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম  
দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ  
রাতির নটার পরে শেয়াল-মানুষ-করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে।

শেয়াল বললে, হৌহৌ।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম  
বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌহৌ নামটা তার ঘেরকম  
মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দু পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে  
নড়াবড়া করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে  
কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হল জুতো মোজা  
দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গৌসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার  
আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে  
দেখলে। শেষকালে বললে, গৌসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল  
হচ্ছে না।

গৌসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা  
নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশবিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর  
লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'খাসা-লেজুড়ি'। যারা শেয়ালি-  
সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'সুলোমলাঙ্গুলী'। দু দিন গেল ওর  
ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাটুকিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে  
গোড়া ঘেঁষে।

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি! লেজবন্ধনের মায়া  
ওর এত দিনে কেটে গেল! ধন্য!

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণসুরে বললে, ধন্য!

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গৌসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হান্কা বোধ হচ্ছে তো?

শিবুরাম বললে, আঙে, খুবই হান্কা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গৌসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সর্বর্ণ হতে চাও যদি, তবে রৌয়া ঘুচিয়ে ফেলো।

তিনি নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন।

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রৌয়ার শোক ভুলে গেল।

সভ্যরা দুই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন--

শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিবুরামের পিসি খেঁকিনি কেঁদে কেঁদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হুকুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হৌহৌকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারটাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলটিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে, হুঙ্কা হুয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কষ্টে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হুঙ্কা হুয়া। এবার শিবুরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না; ডেকে উঠল, হুঙ্কা হুয়া, হুঙ্কা হুয়া, হুঙ্কা হুয়া।

হুকুই বললে, ঐ তো হৌহৌয়ের গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো।

ডাক পড়ল, হৌহৌ!

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌহৌ!

গোঁসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম!  
তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়।  
হুক্কুই, হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে  
দুকল।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার  
লেজ কই, আমার লেজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরে সামনের রোয়াকে ব'সে উর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে  
প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না-- ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা  
শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ।  
জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় খেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা  
চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদু,  
গোবর, বেঁচি, টেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে  
সেখানকার জঙ্গল থেকে কর্মচাপাড়াতে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম--

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষু দেখি ধুঁয়া।

বক্ষ মোর গেল ফেটে হক্কা হুয়া হুয়া॥

পুপে বলে উঠল, কী অন্যায়ে, ভারি অন্যায়ে। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও  
ওকে নেবে না ঘরে?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন  
ওকে চিনতে পারবে।

কিন্তু, ওর লেজ?

হয়তো লাস্পুলাদ্য ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি  
খোঁজ নেব।

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্ কথা  
বলব-- তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে  
পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের  
জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গম্ভীর? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে

উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী ক'রে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি--হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে-- বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চুতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

গেছো বাবা

উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুন্দর লোক তাকে জানে।

পঞ্চু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে-- চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা, একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে-- দেখিস নি? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কী করে বল। ভেল্কি নাকি।

উধো। হৌদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিমমাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্য চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুনুকে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্য তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো। পাচ্ছে বৈকি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুম্বিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস?

উধো। সত্যি না তো কী। গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈকি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, এক্কেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু। বলিস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পঞ্চু। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চু। তবে উপায়?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গো। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

পঞ্চু। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবারই জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই

বলছি, আমড়া পেড়ে নাও-- গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞ্চু। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। ঐ-যে দুলছে।

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের লেজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে-- তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েংবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়-না গাছে।

পঞ্চু। আরে, তুই ওঠ-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ।

পঞ্চু। অত উচ্ছে উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁধে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

[ প্রস্থান

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা ক'রে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভুলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত!  
অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কো পেয়েছে।

## ৪

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর  
অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকাকার  
লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে একে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

ব'লেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে,  
এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার  
ওরিজিন্যালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল  
হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজদার তুমি। এলেম এইজন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন এই আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের  
বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তির  
অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও  
তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর  
অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ কোরো!

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সাল্লাইম যাকে বলে।  
তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।



আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁর বাড়িতে।  
চেহারায তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে।  
মেলে বই কি, সহোদরা বটে।

তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।  
বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন, টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।  
বৌদির ঠিকানাটা?  
সাতাশ মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।  
ভোজন আছে তো?  
আছে বৈকি।

শুনে কোন মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের  
দোষে ভুগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শুনলেই পিণ্ডি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম অতি উত্তম।  
বৌদি আমসত্ত্ব দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে  
তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি--

ব'লেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে, -- টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌,  
টিটিটম্‌টম্‌।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল-- দুজনে হাত ধরাধরি  
ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্‌। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা;  
যমুনা দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ যা  
দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভারের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো  
কনের পরীক্ষা তো চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম।

মনে করলুম মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দূত পাঠিয়েছিলুম  
'রংমশাল'- এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন--

সুন্দরী, তুমি কালো কৃষ্টি।

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে--

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, ব'লে দিলে--

ব্রহ্মা লম্বা হাতে

তোমাকে গড়েছে রাতে

যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি।  
লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।  
মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই-তিন বড়ো হবে। তাই  
শুনেই তো আমার উৎসাহ।  
বলো কী।  
একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।  
এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি।  
যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা  
কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।  
কী রকম।  
মাছের আঁশের হার গেঁথে গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার  
সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।  
আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম, ধন্য! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে  
আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তা হলে আর  
কেন দিন ক্ষণ দেখা।  
কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।  
রূপে?  
না, কথার মিলে। ঠিকমতো মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে  
জলাঞ্জলি।  
পারবে তো?  
নিশ্চয়।  
প্ল্যানটা কী শুনি।  
বলব, চারই লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুশি ক'রে  
দাও।  
মিল হওয়া চাই ফস্ট ক্লাস।  
কনে দেখার যদি পেটেন্ট নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে! বরের স্তব দিয়ে  
শুরু! অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।  
প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না;  
আমার বর্ণনার ধূয়োটি হচ্ছে এই--  
তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।  
পুরো বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে।  
ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ  
ক'রে।  
আমি বললেম--  
স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত।

এক্সেলেণ্ট। কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না। আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে? ভাষায় হোক্ অভাষায় হোক।

একেবারেই না।

তা হলে শোনো--

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,

যখন তখন করো যদ্যুত তদ্যুত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিন্তুত শব্দের এক পর্যায়।

যদ্যুত তদ্যুত, মানেটা কী হল।

ওর মানে, যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান'।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কুল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ খাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছে আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন। চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস্ ক'রে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈষ্ণুস্তুযোগ, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিষ্ণিকরণ, শেষ রান্তিরে অসূকযোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র-- গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে-- ঘরকর্নার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতুলালকে, মোটরখানা আনুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আস্বেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুতুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর, পুতুলালের সে কী চৈতানি! আমি ওকে সাঙ্ঘনা দিয়ে বললুম, পুতুলাল তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিষ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইস্টুপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে তখন বোলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমে চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে

আসি গো। এ দিকে পাকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁড়ড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো পঁয়াক পঁয়াক ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে একরকম ঠিক করে নিলুম। পুতুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিসুরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন চুলোয়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পহরের পথ

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাট্‌নি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকি সুরে বললে, হয় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্ ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুজুদিদির ওখানে-- সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্ষেতেল আর লঙ্কা দিয়ে মেখে।

মুখ শুকিয়ে গেল; বললুম আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরঝা আছে টাট্‌কা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুতুলালকে জিগেস করলুম, খাবি?

সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহিক ক'রে খাব।

বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি।

সে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।

ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গৌফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মের্জাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলায় আওয়াজ যেন গদাইবাবুদের

মোটরগাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুমশায়!

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্র শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্‌ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পাল্লারাম বললে, পরশুদিন সন্দের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গিলাটের বাড়ি। লাটগিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে চ'লে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল; তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব।

পাল্লারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, বলতে বলতে পাল্লারাম আমার টেবিলের উপর দমাদম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শেয়াল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল 'হুঙ্কাহুয়া'। পাড়ার সব কুকুর চৈঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে এক গ্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্টিয়ে বোতল ভেঙে বেগুনি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশনের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীৎকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ঢুকেই পাল্লারামের চোহারা দেখে 'বাপ রে' 'মা রে' ব'লে চৈঁচাতে চৈঁচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল; বললুম, সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।  
লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাড়ি।  
তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে?  
আছে।  
এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।  
জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ডাঙা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব,  
তার পরে বুঝব কন্যাদায় ঘুচল।  
তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়ত সহজ  
হবে না।  
সে বললে, ঠিক কথা।  
একটা ডাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্ ক'রে তুলে নিলে।  
জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে।  
ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুপির মতো ক'রে পরব।  
ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্রামের শব্দ শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে  
ধড়ফড় ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে  
দুকেছিল।  
ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।  
এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি  
যে বলছিলে, তুমি নেমস্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল  
পাল্লারাম।  
সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম  
আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে- পড়ে  
লাগতে হবে যেমন ক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিস খাটে না।  
আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।  
পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো  
কিছু।  
বুঝলুম, বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা  
আছে।  
তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।  
হয়েছে বৈকি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি।  
দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।  
কোথায়।  
নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।  
মানকচু!  
হ্যাঁ, বর আপত্তি করেছিল।  
কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

খুশি হল পুপু; বললে, খুব জন্দ!

৫

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে?

ও বললে, আছে।

চট্ ক'রে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।

কোথায়।

লাটসাহেবের বাড়ি।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।

ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও।

আচ্ছা বলি শোনো--

স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যাল্কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে থিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টর্লনি মন্যুমেণ্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে ঐটো করে দিলেন!

'তোবা তোবা' ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেটম্যান-আপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ- একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্বিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভু পোর্টে ভু সি ভু প্লে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু টান টেনে বললে, তা হলে এম্ফুনি খুলুন ওয়েব্‌স্টার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাঙাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পরশু দিন। ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকটনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাঙায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যন্ত বলে গুড়গুড়িটা কাছে নিয়ে দু টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এইরকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের গুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ ব'লেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল। কিন্তু, অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।

সেটা ছিল না বুঝি?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সুদ্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাকের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্ষেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ার সঙ্গে পাকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্কুল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম ব'লেই সুবিধে। আমি হলে বলতুম--



তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্টি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্‌কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিণ্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙ্‌চুটোর সাঙ্‌চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁক্‌সুটো ফলের ছোবড়া-চোয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিস্টিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্‌ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঞ্জে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেট্‌কু নাডু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উঁচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চল্‌তি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যাঁজি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই  
'তুমি যাও' অনুরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।  
বুঝেছি, আচ্ছা, তবে চললুম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে  
উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ  
যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর  
নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর  
গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি  
বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে; ওর  
বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে।  
কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই  
না।

শুনেনই ফস্ ক'রে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল; ব'লে ফেললে, জান দাদামশায়?  
বাঘরা কখখনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হ'লে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-  
নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস  
নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার  
আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-  
পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পূর্ব-পারে থাকে?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার  
নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আলতা লাগায়।

তা লাগালেই বা?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেটা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার দুই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়-- নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো খরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেতজঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রাদ্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী ক'রে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যা-বাচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল খ্যাংশেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না-- আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির হুকুম শুনেই গা বমি-বমি করে এল; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, খ্যাংশেয়ালির মাংস! যত দূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাংশেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল।

হল বই কি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের ঐটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাতিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘেরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাচ্ছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশ্রী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে-- দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শাদৌল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই

বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক্ কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে-- আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার?

ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিশ ডাকা যায় না।

আচ্ছা, শোনাও-না।

তবে শোনো।--

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,  
গায়ে তার কালো কালো দাগ।

বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে  
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।

এক ছুটে পালালো বেহারা,  
বাঘ দেখে আপন চেহারা।

গাঁ-গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,  
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

টেকিশালে পুঁটু ধান ভানে,  
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।

ফুলিয়ে ভীষণ দুই গৌফ  
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে  
জন্মেও জানি নে তা নিজে।

ইংরেজি-টিংরেজি কিছু  
শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল বুঁটো,  
নেই কি আমার চোখ দুটো।

গায়ে কিসে দাগ হল লোপ  
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, আমি কালো কৃষ্টি,  
কখনো মাখি নি ও জিনিসটি।

কথা শুনে পায় মোর হাসি,  
নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা?  
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।  
পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,  
মুখেও আনিলে হবে পাপ।  
জান না কি আমি অস্পৃশ্য,  
মহাত্মা গান্ধিজির শিষ্য।  
আমার মাংস যদি খাও  
জাত যাবে জান না কি তাও।  
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ!--  
ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,  
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,  
বাঘনাপাড়ায় বদনাম  
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা,  
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা  
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।  
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।

জান, পুপুদিদি? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একাট কাণ্ড চলছে-- যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য ব'লে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম-মন্ড্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব-- এমন কি, বৃহস্পতিবারেও আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব। এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমন কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ?  
হার মানতে মন গেল না। বললুম, হ্যাঁ লিখেছি।  
শোনাও-না।

গস্তীর সুরে আবৃত্তি করে গেলুম--

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান,  
হে বিধাতা-- হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান  
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রখরনখর বিভীষিকা,  
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজ্রশিখা,  
যেন ধূর্জটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ  
ঝঙ্কা উচ্ছৃঙ্খল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ

বনের যে দস্যু সিংহ, সিংহ, ফেনজিহ্ন ক্ষুদ্র সমুদ্রের  
যে উদ্ধত উর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুদ্ধের  
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহিঃশিখা  
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলন্ত জয়টিকা,  
প্রলয়নর্তিনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহ্বল  
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর-- এই যত বিশ্ববিপ্লবীর দল  
প্রচণ্ড সুন্দর। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস  
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।  
চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি।  
ও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা  
কোথায়।

আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে  
ভয়ংকর গোপনে।

পুপু বললে, অনেক দিন আগে গ্লিসেরিন-সোপ-খোঁজা বাঘের কথা  
আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু--

'কিন্তু' না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু--

হ্যাঁ ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার  
মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস ক'রে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়--  
এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না।

আচ্ছা, শোনো তবে।--  
সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ,  
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।  
যথাকালে ভোজনের  
কম হলে ওজনের  
হত তার ঘোরতর রাগ।  
একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ--  
বলে, তোর গিল্লিকে জাগা।  
শোন্ বটুরাম ন্যাড়া,  
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,  
এখনি ভোজের পাত লাগা।  
বটু বলে, এ কেমন কথা,  
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।

এত রাতে হাঁকাহাঁকি  
ভালো না, জান না তা কি,  
আদবের এ যে অন্যথা।  
মোর ঘর নেহাত জঘন্য,  
মহাপশু, হেথায় কী জন্য।  
ঘরেতে বাঘিনী মাসি  
পথ চেয়ে উপবাসী,  
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।  
সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ।  
আছে তো শুটুকে কোলা ব্যাঙ।  
আছে বাসি খরগোষ,  
গন্ধে পাইবে তোষ,  
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ।  
নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ  
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ--  
বাঘ বলে, রামো, রামো,  
বাক্যবাগীশ থামো,  
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।  
তুমি ন্যাড়া, আস্ত পাগল,  
বেরোও তো, খোলো তো আগল।  
ভালো যদি চাও তবে  
আমারে দেখাতে হবে  
কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।  
বটু কহে, এ কী অকরণ,  
ধরি তব চতুশ্চরণ--  
জীববধ মহাপাপ,  
তারো বেশি লাগে শাপ  
পরধন করিলে হরণ।  
বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,  
না খেয়ে আমিই যদি মরি,  
জীবেরই নিধন তাহা--  
সহমরণেতে আহা  
মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।  
অতএব ছাগলটা চাই,  
না হলে তুমিই আছ ভাই।  
এত বলি তোলে থাবা।



বটুরাম বলে, বাবা,  
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।  
দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢুকে,  
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে।  
বাঘ সে ঢুকল যেই,  
দ্বিতীয় কথাটি নেই,  
বাহিরে শিকল দিল রুখে।  
বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার,  
তামাসার এ নহে আকার।  
পাঁঠার দেখি নে টিকি,  
লেজের সিকির সিকি  
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।  
ওরে হিংসুক সয়তান,  
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!  
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে  
থাবায় চাপিয়া ধ'রে  
রক্ত শুষিয়া করি পান--  
ঘরটাও ভীষণ ময়লা--  
বটু বলে, মহেশ গয়লা  
ও ঘরে থাকিত, আজ  
থাকে তোর যমরাজ  
আর থাকে পাথুরে কয়লা।  
গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা,  
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা!  
বটুরাম বলে নেচে,  
এই পেটে তলিয়েছে,  
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা।  
ভালো লাগল?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।  
আমি বললুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি  
আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্যে অন্তত আরো দশটা  
বছর অপেক্ষা করো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।  
সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে।  
রাতিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই  
হাসে।

তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্।  
কথায় কথায় দাঁত বের করে।

৭

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে  
তোমার নেমন্ত্নে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল  
খেতে।

তার পরে?

তার পরে নিজে খেলুম তার বারো- আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু  
ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-যে আমাদের কাঁচকলার  
বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না?

জো কী।

সে এল না?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোথাও না।

ঘরে?

না।

দেশে?

না।

বিলেতে?

না।

তুমি যে বলছিলে, আঙামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল  
নাকি। দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস- পড়বার খাতিরে আমার পড়ে নেবার  
কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমগুন'। এক সময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে  
এসেছে 'পাঁচুপাক্‌ড়াশির পিস্‌শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত  
হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বাম্নির  
মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হতে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ  
পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মুন্লাইট স্নো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে  
ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া

কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙে মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় ক'রে উঠলেম, উস্কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে, তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম কে হে তুমি। পুলিশ ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপোদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপোদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'ষে মুখ মাজছিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্ ক'রে পড়লুম জলে; তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি--

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে; চুলকাতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হল। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেষ্টাই চেষ্টানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; মাথাটার টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখে-বারোটা বাজল, 'খিদে কই' ব'লে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই ব'লে ধুপ্ধাপ্ ধুপ্ধাপ্ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর যদি কর সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্টাতে পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইঁট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ--দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম--

ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গায়ে গায়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকাকার মতো মিটমিট করছে। বুঝলুম, হয়েছে

সুযোগ। নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্ৰা জুতোর ভিতরে যেমন ক'রে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গৌঁ গৌঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, হুস্ ক'রে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিনি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল রোঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চৌ চৌ ক'রে উঠেছে একসঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহনতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। স্মৃতিতে একেবারে গলদঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝতেই পার না কষ্টে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না।

তা হলে চললুম পুপুদিদির কাছে।

খবরদার!

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়ি গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

সে বললে, যাবই।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানাটানিতে গা থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্সর্ ক'রে খ'সে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল।

সর্বনাশ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে। চেষ্টা করে ব'লে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, দুকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোথাও নেই। ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব।

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, সত্যি কি, দাদামশায়।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি-- গল্প।

৮

আমি তখন এম. এ. ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল ইন্টারন্যাশনাল মেলিফ্লুয়ন্স অ্যাব্রাক্যাড্যাব্রা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম থ্রী হপ্পেড ইয়র্স অফ ইণ্ডো-ইণ্ডিটার্মিনেশন বইখানার।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ টিণ্টিন্যাবুলেশন। এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি।

ও বললে নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত। কিন্তু, কী কাণ্ড বাধিয়েছে বলো দেখি।

কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত আজগবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে, তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হল।

কেন কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিষ্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেষ্টা করে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শুনি নি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীর্তি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরাশমতো অসম্ভব গল্প বলার হান্কা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বুঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতু গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হল ফল। পাতুর গা'খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্টিয়ে দাও, ধনুষ্টঙ্কারে মরুক পাতু। গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা ক'রে তার শ্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমস্তন্ন; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা, গল্পের উল্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গল্পটা।--

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টিকিয়ে রাখব তোমাকে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মান্তার, সাত পুরুষে আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হবহ পাতুর; এমন কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা--

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ ক'রে এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাকরুনকে তো জানি, বন্ধু কম দুঃখ পায় নি, অনেক ঝাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হজুর, আদালতে হলফ ক'রে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো শয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্‌সিয়ে বেঁকে গিয়েছিল, সেই বক্সিমচন্দুরে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেকে না; সাহেবকে বললে, এক হপ্তা সময় দিন, খাঁটি পাতু পক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে।

তখনি ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক ঠিক তক্ষুনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিত ক'রে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু!

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যা করি, কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল ষোলো-আনা; যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্ত্রী কি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হজুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকষ্যকুলীন।



রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্যে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐরকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রুঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

## ৯

সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল্প কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ার দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকে সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে, গা সিরসির্ করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জ্ব'লে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুশকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাস্যামা আমি কখনও ভাবি নি।

ঐ হাস্যামাগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সোওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পেরই গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র ব'সে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি

তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফপ্যান্ট-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরৎকালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার বুলিতে একতাড়া খাতা; বুকের পকেটে একটা লাল কালীর একটা কালো কালীর ফাউন্টেনপেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণ্ডিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কজিঘড়িতে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর, ই. বি. আর, এ. বি. আর, এন. ডব্লু. আর, বি. এন. আর, বি. বি. আর, এস. আই. আর-এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি-সুদ্ধ। ধাক্কা খেয়ে মুখ খুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্ চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ করো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-হাঁ-ক'রে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিল না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোটবইয়ে। কজিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়ফড় ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যরা বারো-তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে--

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর' পেটে,  
টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে--  
হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার'  
অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।  
তারো, গরিবেরে তারো,  
তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' ক'রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম! সাত দিনের না-কামানো দাড়িওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দর্জির দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ; ভুলেছ, যেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয়-সংগীত সভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খন্যানে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা-- ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্ঠাকারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেস্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দমদমে।

দমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শখ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্রামের বাসের ঘড়ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে ব'সে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়।-- বাস্।

বাস্ কী, দাদামশায়।  
বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে।  
না, না, সে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। এমন ক'রে তো সব গল্পই  
ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।  
না, সে হবে না কিছুতেই। তার পরে কী হল বলো।  
বল কী-- মরার পরেও?  
হাঁ, মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।  
না, অমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে,  
সেই কথাটা বলি তবে। ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যখন  
খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে  
চৌঁচিয়ে উঠল-- হুঁরা।

খুশি হল কেন।  
ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।  
মগজ বদল হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমানুষ। বের করলে  
তার মগজ। আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে  
দিয়ে খড়ির পলস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল।  
বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে  
দাঁত খিঁচিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে। নস্ দিলে দৌড়। ডাক্তারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর  
দুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে। ও হুঙ্কারটা  
বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে  
বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায়  
মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথগাছ। সবার হাত  
এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে।  
বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌঁছতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায়।  
বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লম্ফ দেখে চার দিকে  
মেডিকেল কলেজের ছেলেরা হো-হো ক'রে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে  
তেড়ে যায়। একজন ফিরিস্টি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রুমাল  
পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা  
ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি  
কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিন্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে,  
কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের

বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।

না, এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।

আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো-না, অল্প একটুখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌঁছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়েবাড়িতে যে কাণ্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

সন্কেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গাঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্শিশ মিলবে। হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সহ্যে না। এর পরে হয়তো আমাকে চাম্‌টিকে কি টিক্‌টিকি কি গুব্বরে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্তি কিম্বা কঙ্ককাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা বুঝেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

## ১০

সন্কেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলাম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্‌চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নের উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে। কোন দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো?

না।

বুন্দেলখণ্ড নয়?

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে?

না।

ঘোড়ায়?

না।

হাতিতে?

ফস্ ক'রে ব'লে ফেললে, খরগোষে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে; জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

কী ক'রে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে শুনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্যে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হান্কা হয়ে যায়।

হয় বই কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছী ছি ছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই--ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্গমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই কি।

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।--আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি যখন রাস্তা দিয়ে

তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ! তারা কিরকম।

তাদের দুটো কান দুটো ঘণ্টা। আর, দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ। দুজাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্খন্ আওয়াজ দেয়; আর একটার গমগম গম্ভীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়?

পাই বই কি। এই, কাল রাতিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।

খরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে?

খুব ভাব। খরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে?

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে?

তার পরে পৌঁছয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পৌঁচেছ।

এখন তা হলে আমি খরগোষের পিঠে নেই?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন আমি ভারি হয়েছি। তার পরে?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে।

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্রের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের সুকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস। তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।



এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্র।

কেমন করে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে।

তুমি বেশ একটু ভুরু কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া!

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না-- ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুত্র! ওকে আমি জটায়ুপাখি ব'লেও মনে করি নে। ভারি তো!

একটু শান্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর একজামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পরশু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্র।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে! আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে। কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্‌হ্যাট্‌ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও?

চাই বই কি।

ছাতাটা ফস্ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ জন্যে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।  
আমি বললুম, ছত্রপতি।  
নামটা পছন্দ হল। রাজপুত্রুর ছাতার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, ছত্রপতি!  
নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজে!  
আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম। আজে, তা  
নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রাজপুত্রুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে; রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল,  
রাজপুত্রুর, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা  
চটা।

শুনে রাজপুত্রুর মনটা ছটফট করে উঠল। ছাতাটাকে থাবড়া মেরে বললে,  
এখুনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারি ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে  
পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি ক'রে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা  
মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

সুকুমার মাস্টারের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু  
সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের।

পাঁচটায় সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাদু, তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্ডনম্বর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্যে পয়লা নম্বরের  
গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

১১

মাস্টারমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন।  
আমি যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।  
সামনের তেতালা বাড়িটাকে পড়তি বেলাকার রোদ্দুর আড়াল করেছে। গিয়ে  
দেখি, চিলেকোঠার সামনে সুকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম  
করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো  
আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্রুর।

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি-- হলুদে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্র। খানিকটা আম্তা আম্তা ক'রে বললে, তুমিই বলো-না, দাদু, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িলে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কামরাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝরঝর্ শব্দ ক'রে-- আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধ্যা, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিণে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না-- কিছুই না-- কিছুই না।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে, দাদু।

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমার বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুহু করে উড়ে আসে, মৌমাছির খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমরা পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।

সুকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব।

ঝুঝুতে পারছ তো, পুপুদিদি?-- রাজপুত্র তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে,

আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিত থাকব?

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হল।

শুনলে না? একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা

ঐ-যে, চঙ চঙ ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।

হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুস্রা রাজপুত্রের খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অন্ধের হরণ পূরণ নয়-- ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সহিতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, লাখখানেক ঝাঁঝিঁ-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্যাওড়াবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান সুড়সুড় ক'রে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝাঁঝিঁ ঝাঁঝিঁ শব্দে চাঁদনি-চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্ খস্ শব্দ করতে ঝরে-পড়া শুকনো পাতাগুলো। ঝর্ ঝর্ করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্ধে-ভুর-ভুর সর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তির্পূর্ণির ঘাটে তখন ধামা-ভরা বিনিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের গুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল্কলিয়ে। তিন পহর রাতে শোয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হ্যা, ক্যা হ্যা! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হ্যা। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাদুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোষে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিকরে-পড়া সংকেত। সদ্য-জেগে-ওটা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে-- তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একটুখানি হেসে বললে, ঐ-যে আমার ছেলেমানুষির কাহিনীটি শোনা গেল-- এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হল। আমার

হিংসুকে স্বভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে-- সে কথাটা চেপে গেছ। সুকুমারদা নাহয় অঙ্কই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্নেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম-- এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জ্বালায় তুমি সুকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অনুরাগবশত-- আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি যাকে বলতে সে, তার হল কি।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যারোল্যাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝঁকে ঝঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক-না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্কেল দাঁতের অভাবে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শত্রুও করতে পারবে না।

তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।

তাই সই।

## ১২

ঝগড়াকে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা। যেখানে পাও বোলাও উস্কে।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি

ওয়েস্টকোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়-- পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা-- বাঁ হাতের আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো-- কোনো একটা সদ্য অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুদুটোর নীচে চোখদুটো যেন মন্ত্রে-থেমে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুকনো মটর চিবোচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়। বললে, বাবুর চোখদুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধন্বা দিয়ে পড়েছে।

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মুন্সি, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছে যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চাঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

কিসের প্রমাণ।

বেসুরের দুঃসহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদসুরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মানুষেরা। বসে বসে আধ চোখ বুজে অমৃত খাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব ওস্তাদের তম্বুরা ঘাড়ে অতি নিখুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর নুপুরঝংকারিণী অঙ্গরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধরে অসুরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপটার বেলয়ে বেসুর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেসুর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল সুরওয়ালাদের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হংকার ক্রেংকার ঝন্ঝন্ঝকার ধ্রুংকার দুডুম্কার গড়-গড়গড়ংকার শব্দে। তীব্র বেসুরের তেলেবেগুনি জ্বলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলে ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিদ্যে, আসল খবর কানে পৌঁছয় না। আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে মশানে, গুড়তত্ত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী

গুরুর মুখকন্দর থেকে বেসুরতত্ত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেঙার বিরেচক তৈল মর্দন ক'রে।

বেসুরতত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা বুঝতে পারছি। অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিশ্রীমুখ থেকে-

গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিশ্রীমুখ!

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখই পুরুষের গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই কি।

মধুর রসে তোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দুর্বলতা-- মিঠে সুরে যার নাম দিয়েছ সুরুচি, বিশ্রীকে সহ্য করবার শক্তি নেই যার।

দুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।--বিশ্রীতত্ত্বের গুরুবাক্য শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব থেকে গুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবসৃষ্টির শুরুতে চতুর্মুখ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো দুটো মুখ থেকে মিহি সুর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মসৃণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যন্ত। সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যুষের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারই মৃদু হিল্লোল দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বরুণদেবের ঘরনী।

বরুণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভুব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি। সেই জলে পানকৌড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমৎকার। কিন্তু, তখন পানকৌড়ির সৃষ্টি হয়েছে না কি।

হয়েছে বৈকি। পাখিদের গলাতেই প্রথম সুর বাঁধা চলছিল। দুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দুর্বল জীবগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে। একা কথা বলি, রাগ করবে না তো?

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমাম্বিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন ঐ পাখির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামণ্ডপে; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে

থাকো শূন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা- কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্র হয়ে।--কবিসম্রাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সেদিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদ্মে, যখন মনোহরদুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্মুখের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয় না। স্বয়ং নারীরাই করুণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সুকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।--কী চাই।--কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁদুলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি সুবচনীরা পালা।

কৌদলের উপযুক্ত উপলক্ষটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমগ্ন রইল অতলে, বাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বড়ো দুঃখের চতুর্মুখ লজ্জিত হলেন বোধ করি?

লজ্জা ব'লে লজ্জা! চার মুণ্ড হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। রাজহংসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাদুটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সাদ্ধী পরম-পানকৌড়িনী, শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরমহংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চঞ্চুঘর্ষণে পালকগুলোকে ডাঁটাসার ক'রে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত ব'লে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্বপ্রধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুদ্ধসত্ত্ব হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভূরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে। বাস্ রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা-- অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষগর্জনে মিলে দ্যুলোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর ঢেঁকির পিঠ খাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেঁকি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেসুরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙবার কাজে লাগবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মার চার গলার ঐকতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিগ্‌নাগেরা শুঁড় তুলে, শব্দের ধাক্কায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে--বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্মশানঘাটে।



হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারন্ধ্র থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেসুরপ্রবাহ-- গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ হুড়মুড় দুর্দাড় গড়গড় ঘড়ঘড় ঘড়াঙ। গন্ধর্বেরা কাঁধে তম্বুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের খিড়কির আঙিনায় যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জচ্ছায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধূমে ঢুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পাষিতা, ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেসুরো ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় কামানের মুখের তপ্ত গোলার মতো ধক্ধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ।-- কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বই কি। একেবারে দুম্‌দাম্‌ শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেসুরেরই রাজত্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো?

বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে টুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুগুলো তুলে। ভুলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব ব'লে মান কি না।

মানি বই কি।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবর্দস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো-- এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বই কি।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-সোঁ-- কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভারতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ ব'লেই ফেলো না।

আমি ভাবছি, আর্ট মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেসুর- ধ্বনির আর্টকে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের সুরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাদ্যযন্ত্রে। যদি বেসুরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষদেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডবনৃত্য করেন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্‌বম গালবাদ্য, আর কড়াকড়

কড়াকড় ভমরু। ধ্ব'সে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেসুরের আদি-উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো?

হয়েছে।

মনে রেখো সুরের হার, বেসুরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা-- দুই কানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার! ঋষি মুনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিকরিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর সুরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ দুড়দাড় ক'রে এসে পড়ল বিদ্রীকরূপের বেসুরি দল, শুচিসুন্দরের সৌকুমার্য মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড। কুশীর কাছে সুশ্রীর হার, বেসুরের কাছে সুরের-- পুরাণে এ কথা কীর্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অটুহাস্যে, অন্নদামঙ্গলের পাতা ওল্টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেসুরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতনু গজানন সর্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পূজো, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেষ্ট। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল', ব্যাঘ্র বল', বলদ বল', যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন কি, ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত দুর্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শত্রু মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব-- লাখি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে-- তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে ঝাঁঝিটখাম্বাজ আলাপ করা। তার চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু বেসুরো অনুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তার কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার বুল্ডগ্ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিধাতা যদি দেন শ্যামাদোয়েলের শিষ্য, ও তা হলে নিজের মধুর কণ্ঠের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চলতি মোটরের তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্যি করে বলো, কালিঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ

ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা যে সুমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাঙার শক্ত সন্তান, বেসুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দুম্‌দাম্‌ শব্দে দুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেসুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্য জাতরা আজ বলছে, বেসুরটাতাই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষই দুর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খুস্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেসুর চড়ে যাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেসুরমন্ত্র সাধন করবার জন্যে আমরা হৈহৈসংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল; দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যম্। বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই--গলদঘর্ম ওঠে, তবু ভদ্রলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্যেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো--

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,  
হৈহৈপাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।  
হেথা-সা -রে গা-মা পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,  
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ--  
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।  
তারহেঁড়া তম্বুরা, তালকাটা বাজিয়ে--

মুখ চোখ লাল, চুলগুলো  
উস্কোথুস্কো, দশা পাবার দশা।--  
মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট্রা,  
মারহাট্রা, ওরে মারহাট্রা।  
ছুটে আয় দুদ্দাড়,  
ভাঙ মাথা, ভাঙ হাড়,  
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্রা।  
আন্ ঘুষো, আন্ কিল,  
আন্ ঢেলা, আন্ ঢিল,  
নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক ঠাট্রা।  
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম  
দুন্‌দাম ধুমাধুম,  
ভেঙে চুরে চুর্‌মার হোক খাট্‌ট্রা।  
ঘুম যাক, মারো কষে মাল্‌সাট্রা।  
বাঁশিওলা চুপ রাও,  
টান মেরে উপ্‌ড়াও  
ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।  
বেল জুঁই চম্পক

দূরে দিক ঝাম্পক,  
উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের  
ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গয়াধামে  
ঐ লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুষল, ওটাকে ছিঁকুটে  
নাস্তানাবুদ ক'রে তার উপরে ফুটকি বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় ক'রে বললে,  
আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বললুম, ঐ-যে মারহাটা শব্দটা তোমার  
মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিষ্যতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে  
ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। শুধু ডাঁটা ধরে খাড়া  
রয়েছে ধ্বনির মারমূর্তি। এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই--দেখো, কী মূর্তি  
বেরোয়--

হৈ রে হৈ মারহাটা

গালপাটা

আঁটসাটা।

\* \* \*

হাড়কাটা ক্যা কোঁ কীচ্

গড়্ গড়্ গড়্ গড়্.....

হুড়্‌দুন্‌ দুদাড্

. . . . .

ডাণ্ডা

ধপাৎ

ঠাণ্ডা

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার

\* \* \*

মড়্ মড়্ মড়্ মড়্

দুড়ুম.....

হুড়্‌মুড়্ হুড়্‌মুড়্

দেউকিনন্দন

ঝঞ্জন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহারী

তড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্

খট্‌খট্‌ মস্‌মস্‌

ধড়াধড়্

ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌

হো হো হু হু হা হা--

ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হঃ--

ইনফর্ণো হেডিস্ লিষো।

দাদা, তোমার নকল করি নি, এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে।

খুশি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে, দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেসুর-হিড়িম্বের দিগ্বিজয়।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল।

পুপু বললে, ধাঁধা লাগল।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, সুরাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিদ্রোহী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্ত্রীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে-- কিন্তু বীভৎসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘুষি উঁচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সাল্লাইম।

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আশ্রয়লাভটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।

১৩

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমানুষের মতো মুখ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। সুযোগ পেলে মশ্গল হয়ে ছেলেমানুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই যদি ছেলেমানুষি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমানুষিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলাম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অদ্ভুত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমতো মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বই কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শত্রু কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বন্ধু ছিলুম একলা আমি। লোকে যখন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাঙাৎরা তোমার বিদ্যের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইটাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজন্মেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মাপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুঝি তোমার বুলি?

পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি।

তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাধারার ব'হে যাবার প্রণালী ঘেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের

যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত- অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে ব'লে হেডমাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেডমাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে দিয়েছি তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বলা বাহুল্য, মাস্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মনে হচ্ছে, মাস্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্তগাড়ি পার করত। বুঝেছ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন-দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

পুপে সগর্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম বুদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাট্টা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অদ্য যুদ্ধ হুয়া ময়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি না।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না?



মাস্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষে প্রিয়সখীর পর্সেন্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডারের কৌটোটা ঐ প্রিয়সখীকে দান করেছিলে?

আমি কখনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সর্বর্ণ-- বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্যান্যস্তুতি, ম্যুচুয়ল অ্যাডমিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি আছে-- একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইণ্টারেস্টিঙ।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেলুম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্রীপুজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে।

আমি বললুম, মাস্টার, গল্‌দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল?

মাস্টার বললে, ছিল বই কি।

তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শাণ্ট ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শাণ্ট করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আঙুরলাইন ক'রে দিলে; ওটাকে ভালো করে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁঠি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস।

কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হত 'দেখাই যাক-না'; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থটার বিরুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবির তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকে আঙুরলাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রুচির প্রসার বাড়ার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে?

আছে বই কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংস্কারমুক্তিই তো অধিকারব্যাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা--

বাড়িয়েছি বই কি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে দ্বিরুক্তি হয়, এইজন্যে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাংলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাস্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি?

না।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেন দাহ্য মেজাজ ঘুচে দৌঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিনি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও তোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজত্বটা তার কটাক্ষে খেত দোলা; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটার্ন টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ডেরাগাঁজিখাঁয়ে, গিনিহ অস্তর্ধান করতে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কিরকম ক'রে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি-- পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারি ভারি জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের যে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধ'রে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য

লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগে ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্কুলে সূক্ষ্ম জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহ, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্কুল বুদ্ধির বাধাও নেই?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাভাবিক আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে-- এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্কুল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।  
সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো? ইলেকট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইটস্-এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে।  
ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো, দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে  
বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো?

[আচ্ছা, গান?] শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে, ব্যাকরণ  
মুখস্থ করতে হবে না।

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে  
থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে  
অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেকট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাৎনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাৎনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো  
দেহধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

## ১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশ-মতো পুপেদিদি নিয়ে এল  
পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয়  
খাদ্যবিধির রেনেসাঁসপ্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ  
স্বপ্ন দেখছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই--  
স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা  
কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল।  
সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা  
বানিয়ে বানিয়ে বলছিলাম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ ক'রে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আলট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান? দৃঢ় বিশ্বাস।

জান কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম-- সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেন আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়াস্লে অনেক বুজুর্গি করছে; মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিসেকে সোনা করছে-- তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে আর একজন-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্বনাশ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্টি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হ'ত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ ক'রে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কখ্খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তুটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম-- এত কী সুবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে-- এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহাসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম-- দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বই কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে।

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘেভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষার মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সিরসির্ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব; কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকারকম ক'রে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হ'ত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্য দিকে।



পুপে বলে উঠল, জানি, জানি, সুকুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে ক'রে যখন নাচাতে, তার স্নেহের রসটা ষোলো-আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করেছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা সুদূরতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ও-পার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে: বেলা যায়।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হল।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর- কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে ঐকেছ।

হাঁ, ঐকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্দ্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়-- হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পাল্লিনৌকোথানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম, আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াফের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিমঝিম করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো স্তব্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে; তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে--দুই পহর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইঙ্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাটবল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্দুরে।

শুনে আমি চুপ করে রইলুম; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব ব'লেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

সুকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি-- এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল দুজনে মিলে; সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি,শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রমাণ করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে যুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে--

মনে আছে,একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। যুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি আঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ঘরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই,নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা

ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌঁছব, সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদা'র এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না ব'লেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটি মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

গল্পসল্প

## বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর ক'জন লোকে দিতে পারে।

তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হুলুস্থূল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে ক'জন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুঝি?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্য নূতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হুলুস্থূল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অদ্ভুত-- বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারু নাপিতকে। বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগ্নে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাগ্নের গালে এক চড় মেরে বললে,  
বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।

নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না।

বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি  
সেটা কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে।

বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।

নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে। এখন  
চুপচাপ ক'রে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়াসুদ্ধ  
অস্থির করে তুলেছ।

সামান্য একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না ব'লে।

দেব টাকা -- ওরে ভুতো।

আজ্ঞে--

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

ভুতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খুঁজে দেখলে থলি আছে, থলিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দর্জিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুষেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল-- সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ  
করে দিলে ৩৫১ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিশ  
পাঠিয়েছিল।

তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাদুড়বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার  
বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাদুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে--দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোটবুকে বাদুড়বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাগ্নে বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে।

মুশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাদুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ, গিনি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাথামুণ্ডু হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।

সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদ্দারের গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। তোমার নাম কী বলো, আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখস্থ করে রাখব-- ১৩ নম্বর, শিবু সমাদ্দারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা। যেদিন ওঁর একপাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী ধুলুমার বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে-- তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।



আমি বললুম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেলুম নীলুর বাড়িতে। বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা দুটো তিনটে ক'রে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুচি আসে দরোয়ানজির নাগরা জুতোয় সুকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে দুঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে।

আমি বললুম, অমন কথা বোলো না দিদি, অন্ধশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অন্ধ ক'ষে ক'ষে ওর বুদ্ধি এত সুক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওঁর অন্ধ নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ডে দেরি কেন হয়, এ তাঁর অন্ধের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাসৃষ্টি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অন্ধ কষছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকন্না ঘুরতে ঘুরতে চলবে না, তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত

ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি-- একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।

\* \* \* \* \*

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে  
টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফরমাশে।  
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের  
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।  
বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দরমা।  
ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা।  
কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।  
শাঁকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে।  
বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিন্সের,  
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের।  
বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী।  
ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি।  
দেখলেম কিনছে যে ও পাড়ার সরকার,  
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।  
কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী  
বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি।  
মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ ক'রে,  
ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে।  
বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জব্দ--  
ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ।  
বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে।  
ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে।  
এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের বুড়িটা--  
দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।

## রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল।  
ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি  
তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন?

তুই যে উল্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে?  
তবে?

করে অবুদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা  
বোকা, সেইখানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ  
হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম।  
আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই; ইরু  
ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইরুমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না;  
এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার দুধে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি হাঁ  
করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে  
ছটফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার  
বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নম্বর রীডার; মাস্টার মশায়কে জিগ্গেস  
করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে; বলতুম, এই বাড়িতেই!  
কোনখানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-  
আম-কাটা ঝিনুকটা দেব।

সে বলত, মন্তর বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।-- তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইঙ্কুলে। একদিন জিগ্গেস করেছিলুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব একটা-কিছু মনে করত। হয়তো একদিন ইঙ্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেলায় কাণ্ড।

ব্যস্ত হয়ে জিগ্গেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত-- কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেলায় কাণ্ড।

ইরু গিয়েছে হস্ত-দন্তর মাঠে যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চ'রে বেড়ায়, মানুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি! ও বাবা!

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকন্না-- সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইরুর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মাস্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইরুকে জিগ্গেস করতুম, অন্য সময় গেলে কী হয়।

ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় ইরুর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা।

তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইরু গেল স্বশুরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে-- ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি-- ও বাবা।

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।

মা বলে, দেখ, ঐ আকাশে আছে লুকোনো।

খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে।  
মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থলিটা ভ'রে  
নিরে গেছে ইন্দ্রলোকের শাসন-ছেঁড়া ছেলে।  
খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে।  
মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি  
চৌধুরিদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিলি,  
যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নষ্ট।  
মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পষ্ট--  
গাছের ছায়ার চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে,  
কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে।  
কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুখ গুঁজে,  
সেই সুযোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে।  
আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে,  
কাটবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে।  
তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল,  
মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেয়ের দল।  
তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্যে মাথা কোটে,  
মেঘের ডাকে জানলাগুলো খড়খড়িয়ে ওঠে।  
ভেবেছিলুম, শান্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি,  
জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুষ্টুমি।  
খোকা বলে, ঐ যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে--  
তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেলে।  
ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে--  
ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে।  
আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল,  
ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গুণ্ডগোল--  
সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে,  
সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে।  
তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে,  
মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

## বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম ক'রে, দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে বিস্তর রাবিশ।

সেগুলো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে সেই খাঁটি খবর।

আমাকে খাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি-এ পাশ করতে হ'ত, সব রাবিশই তোমার টেবিলে উঁচু করতে হ'ত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা, টেনে বেড়াতে হ'ত খাতা বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্ঠক করতে করতে মাঝির বিচার-সভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলে খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটোলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না, ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও,

সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবন্ধিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইংরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপঝপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এমন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো-- ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক।

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয়? তুমি ঠাট্টা করছ।

দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর, আমি?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্কচ্ করে সেখানে দেবে একটু তেল।

দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বুঝেছ তো?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি। ওর ইরুমাসির চেয়ে ও বুদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,

মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।

দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছজন গোলাম তাহার পাছে,

একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তত্ত্বে আছে।

পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,

বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;

আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,

ওরা মরে ঝাঁকে ঝাঁকেই শুধু লড়াই ক'রে--

ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,

আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া।

## চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান?

জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাৎ এক-একজন উৎরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান তো, আমি আর্টিস্ট-মানুষ। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই-- চোর-ছ্যাচড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার উপর থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজ্ঞে হ্যাঁ, গামছা বই-কি। কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের ছেঁড়া গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে?

আমি ভাবছিলুম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাবুআনা চলে কী ক'রে।

বোধ হয় ধার ক'রে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি।

আচ্ছা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্ত্রীর ময়লা কাপড়ের ঝুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচলুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।



তুমি জানলে কী ক'রে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিশ আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোথেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে? তিনি নিজে থাকেন কপ্পি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো? ঐ যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার-- আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ওঁর মুখের সামনেই শুনিতে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইংরমি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দুকেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খ্যাকুশিয়ালি ব'লে চেষ্টাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরুব্বি সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।--

আলো যার মিটমিটে,  
স্বভাবটা থিট্‌থিটে,  
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,  
সব ছবি ভুসো মেজে

কালো ক'রে নিজেকে যে  
মনে করে ওস্তাদ পোটো,  
বিধাতার অভিশাপে,  
ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,  
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,  
খঁয়াক্ খঁয়াক্ করে মিছে  
সব তাতে দাঁত খিঁচে,  
তারে নাম দিব খঁয়াক্শেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিশ যে।  
ব্যাপারটা কী।  
চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।  
হ্যাঁ, কিসের কেস।  
অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।  
মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিশের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার  
ছেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে  
করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে।  
কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।  
দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না।

যেমন পাজি, তেমনি বোকা,  
গোবর-ভরা মাথা,  
লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা।  
কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই,  
আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই;  
কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে--  
প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে।  
হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত,  
স্ত্রীর ছিঁড়ে দিই নথ।  
রাঙ্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিট্‌মিটে;  
দিনরাত্তির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেয়।  
বদ্‌মাশকে শিক্ষা দেব-- অসহ্য এই ইচ্ছে  
মনকে নাড়া দিচ্ছে।  
লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই পষ্ট--  
অতি খারাপ, নিতান্তই সে নষ্ট।  
পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা,

মনের ঝালটা ঝেড়ে নিতেম যদি থাকত একা।  
বুকটা ভ'রে অকথ্য সব জমে উঠছে ঢের,  
লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,  
যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন--  
খালাস পাবে মন।

## রাজরানী

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র।  
কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সত্যিকার  
গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন  
বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে  
ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-  
উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ  
অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ  
নেই। এবার শুরু করা যাক।--

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল  
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী  
দেখলুম; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক। কারু  
দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা  
জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন-- চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট,  
হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসির  
সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে  
আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেলকাঠের দণ্ড। 'বোম্ বোম্  
মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল-- বাবা পিনাকীশ্বর  
নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ  
হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভূঙ্গলাঙ্গন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহান্কা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাই আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্তরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি ক'রে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রাঙ্গী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিनी হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশজ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরনার জলে স্নান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো ঢুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে ঢুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রান্ধির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্য হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই- সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরোজায় ব'সে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব  
রথ সমস্ত রইল বনের বাহিরে। বৃদ্ধের পায়ে কাছ মাথা রেখে প্রণাম করলেন;  
বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে।  
এতদিন পরে পেয়েছি-- যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী-- কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে  
নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি  
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।  
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।  
সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।  
আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,  
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।  
আমি যে তোমার দ্বারে করি আসাযাওয়া,  
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।  
যখন ফুটিয়া ওঠে যুথী বনময়  
আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।  
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে,  
আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।  
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা,  
আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা।  
যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি  
ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তখনি।  
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,  
কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি।  
অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,  
'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে জেগে।  
পূর্ণিমারাত্রে আসে ফাগুনের দোল,  
'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল।  
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,  
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।  
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,  
কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

## মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন।  
এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।  
সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস, তা বলা শক্ত।  
তিনি বুঝি পাগল ছিলেন?  
হ্যাঁ, যেমন পাগল আমি।  
তুমি আবার পাগল? কী-যে বল তার ঠিক নেই।  
তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুন।  
যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।  
তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।  
দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে।  
বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।--

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্সি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে, কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমর তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কমতি সেটার নজীর বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্সি পড়া বিদ্যে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চাঁচনি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে



আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু, তিনি কপাল চাপড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না-- একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা ব'লেই টেকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর রুটি বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্রুজ সাহেব ছিলেন ইন্স্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইন্স্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কার্দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, সাবাস্! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাস্', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়? আমিও ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ

থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে।

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,  
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।  
ইংরেজ ফৌজের সাথে দ্বার রুদ্ধে  
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।  
ঘোড়া টগ্‌বগ্‌ ছোট্টে, ধুলা যায় উড়ে,  
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।  
ইংরেজ দুদাড় কোথা দেয় ছুট,  
কোন্‌ দূরে মস্‌মস্‌ করে তার বুট।  
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,  
দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে।  
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা  
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।  
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,  
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।  
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা--  
রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।  
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে  
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে ঐটে।  
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,  
ভুদু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।  
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ  
হাততালি দিতে দিতে চ্যাঁচায় প্রতাপ।  
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,  
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

## ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক দুষ্কর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গস্তীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির টিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি-- এক সময় তার লুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অদ্ভুত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিলুম। কেননা তখন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শ্বশুরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল আলাদা, তোমার ইরুমাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্যার রাতে আলাপ পরিচয় হ'ত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসর হরীশ হালদার। নামের গোড়ায় পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সন্কেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা

খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ওই দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস কিন্তু তোমাদের ঐসব ঋষিমুনির কথায় জ্বলে না। দরকার হয় জ্বালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হর্তকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে?

পার বই-কি। হিড়িং-ফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না-- কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণদ্বাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুক্রবারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না-- তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হ্যাঁ, রাজা হয় না মাথা হয়। শঙ্খ জিনিসটা শঙ্খ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শঙ্খটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শঙ্খ যাবে ক্ষ'য়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ব'সে ব'সে, বাঁ হাতে হুঁকোটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের ক্রটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইরুর মন্তর তন্তর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাথাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই--  
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।  
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি  
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।  
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি--  
সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,

বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্তা  
বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা,  
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে  
একেবারে চ'ড়ে বসে ঊনপঞ্চাশে,  
ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই;  
পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশে কোনো মজা নেই।  
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে,  
কবির শূনেছি তারি রাস্তাটা জানে--  
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের  
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

## পরী

কুসমি বললে, তুমি বড্ড বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্প শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে দুরকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে-- আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না।

আমি বললুম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ।

আরও-সত্যি কাকে বলছ একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও-সত্য।

খুশি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল একজামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোলবৃত্তান্ত মুখস্থ করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী বলে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সহবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে দুলছে। তোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নৌকোয়। নৌকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি। আমি কি সত্যিকে মানি। এ হল আরও-সত্যি।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।  
আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া  
এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে  
কি অনে--ক দূরে।

আমি বললুম, সে খুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না।  
আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না; এবার যখন তুমি তাকিয়ে  
দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে  
মেঘের খেয়ানোকো এসে পৌঁচছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও  
নৌকোয় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল  
তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর  
তোমার আরও-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে  
তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার  
সেই ক্ষমতা আছে-- কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি।

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার;

বাপ মা তোমায় যে নাম দিল খোড়াই করি কেয়ার।

সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী;

আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অঙ্গরী।

কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,

সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল;

কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যারে

তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে।



## আরও-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যের কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্থানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে একজামিন পাশ করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা।

সে কী কথা, দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।

ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চড়ে বসি। কোনো দেশে যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে-- ফুচুং, হ্যাংচাও, চুংকুং; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উস্খুস্ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুরের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল দুই থাবা তুলে।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।

যখন ক্লাশসুদ্র ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তা হলে কী করে।

ওর সহজ উত্তর হচ্ছে-- আমি পাশ করি নি।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো সুন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দুই ধারে দুই চাঁপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুনুটি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল

বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর দুধের মতো সাদা ময়ূরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফস্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্র।

সে কী কথা। তুমি তো--

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্র, তাই তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গন্ধে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

--দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো দুঃখিত হবে। শেষকালে হল বিয়ে-- হ্যাংচাও শহরের আদ্রেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। ক'রে--

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হ্যাঁ, চড়েছিলুম-- সে উট কোথাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুসুং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুসুং পাখি? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুসুং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্যা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দুঃখ কোরো না, তখনও তুমি জন্মাও নি-- সে কথা মনে রেখো।

আমি যখন ছোটো ছিলাম, ছিলাম তখন ছোটো;  
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।  
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্খী নদীর মোড়ে,  
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকো চ'ড়ে।

চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে  
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।  
রৌদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো  
মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।  
নাককেশরের তলায় ব'সে পদ্মফুলের কুঁড়ি  
দূরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।  
একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।  
জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি যেয়ো।  
রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,  
মণ্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা।  
ঘোড়সওয়ারি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে,  
রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোড়ার রথে।  
আমি থাকি মালঞ্চতে রাজবাগানের মালী,  
সেইখানেতে যুথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।  
রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাঁপার ডালা,  
বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।  
মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি--  
তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি।  
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,  
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর-ময়ূরীতে।  
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়  
বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সন্ধ্যায়।  
বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,  
নাগকুমারী মুখের 'পরে টানল নীলাঞ্চল।  
ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে।  
ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে।  
সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।  
পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।

## ম্যানেজারবাবু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার দল ছেড়ে--

চিতোর থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না?

হয় বই- কি-- সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মানুষটা ছিল সামান্য একজন জমিদারের সামান্য পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক সুজনলাল মিশির। একটু নামের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'পুণ্যাহ' খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি-- যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভরতি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্করার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়ারগৈয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প'রে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দুধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া-ঘড়া দুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে ব'সে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাহ্মণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হুজুর আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেকদিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্‌কাত। দায়ে পড়ে জসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে-- এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাদ্র

মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি।

ম্যানেজার তখনও দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিসুটি মেরে ব'সে সবাইকে আটকাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা-- শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালালো। একটা এসে বিঁধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে, ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির শড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি-- এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া-- এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!

তুমি ভাবো এই যে বোঁটা  
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,  
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো--  
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও  
আলগা করে বাঁধন স্বীয়

তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।  
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,  
অপমানের থেকে বাঁচায়,  
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;  
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,  
গোপনে রয় একা একা,  
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।  
বনের ও তো আদুরে নয়,  
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,  
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার;  
রস জোগায় সে চুপে চুপে,  
থাকে নিজে নীরস রূপে,  
আপন জোরে বহে আপন ভার।  
কাঁটা যখন উঁচিয়ে থাকে  
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে--  
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,  
পশুর কামড় থেকে যারে  
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে  
সেই তো জানে কাঁটার কত দাম।

## বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই-কি। কম তো জমে নি।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি-- কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে!-- মানে ছিল বই-কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অদ্ভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিতে তাকে লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদিহিদ্ হিদিঙ্কারে আমার পাঁজগুরিতে তিড়িতক্স লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুশুল গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ কুম্কুর।

মথুরাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচকুম্কুর। পাঠশালার পেড়েগোকে দেখলেই তার আন্তারা যেত ফুস্কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ুকুর কুড়ুকুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে

যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুম্‌কি। একটু রসুন-- বুঝিয়ে বলি। পেড়েগো কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেড়েগো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত-- ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সধ্বংসনিত হার্দিক্যে বুদ্ধবুদ্ধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুগুস্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আনুতারা ফাঁচকলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃষ্ট ত্বরিত্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থংসিত --

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উত্থংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উত্থংসিত।

তার মানে?

তার মানে উত্থংসিত।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ তার মানে হতেই পারে না। মেরেকেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিরড্রিংগট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে যান।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃষ্ট ত্বরিত্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থংসিত নিরংকরালের সহিত--

মথুরাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল--

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে-- মুশকিল হবে।

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যাস্মিত গর্গরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সমুসদগারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত ব'লে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?



মথুরাবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশত্রুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদগারিত করে দিলে গো-- একেবারে পরমন্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্ অফ হুমায়ুন।-- শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্কায়েত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুন্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঞ্চুসের একেবারে চিক্চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্জিম্ মাজ্জিম্ করছে।

বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্বুদী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা,  
যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা--  
এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বুজ্জুল,  
আদ্রুম ডাকত সে যে ছিল অতুল।  
মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,  
কাশিরাম মিত্তির হল পুচফুস।  
পাঁশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ,  
আজ হতে বাজ্রাই হল আশুতোষ।  
ভুষকুড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার,  
কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেমদার।  
যেদিন যুথীরে নাম দিল ভুজকুশি,  
সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুষোঘুষি।  
পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে  
দাদা এসে রাস্কেল ব'লে গেল তারে।  
মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা,  
সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা--  
পিত্ত নাশিবে নাম যদি হয় তিতো,

ভুজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো।  
পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি,  
ভাবীকালে পৌঁছিয়ে দিব তবে গাড়ি।  
বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,  
পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।  
দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি,  
সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।  
শুনলে সে কেস্ হবে ডিফামেশনের,  
ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

## পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের।

জান, দিদি? তোমার পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই--

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন-- তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুর্বের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুমগুলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমন্তন্ন।

জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার দুইনম্বরের কথা শোনো; সে বাচস্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুম্বুলের বাসা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী।--

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, কলকাতায় হয়েছি মানুষ। বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম-- পাঁচকুণ্ড গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌঁছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাত্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, দুর্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়ো

গ্রামে বিখ্যাত গণংকার মধুসূদন জ্যোতিষী কুষ্ঠি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব স্ফূর্তি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কষাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মানুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।

তা হলে, এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদুরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরুলুম। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্চিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজাজানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বন্ধুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের ঠেলা দিয়ে বললুম, কেমন!

পান্নালালের গল্পটা শুনে বাচস্পতি মুচকে হেসে বললেন, ভোরস্তোল।

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,  
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।  
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,  
পুরোনোটা বারে বারে নুতনেতে চড়ে।  
গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে  
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে।



## চন্দনী

জানোই তো সেদিন কী কাণ্ড। একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও খোঁচাখুঁচির তাগিদ। যমরাজার চরগুলি খবর আসার সব দরজাগুলো বন্ধ করে ফিস্ ফিস্ ক'রে মন্ত্ৰণা করছিল। এমন সুবিধে আর হয় না! ডাক্তারেরা কলকাতায় নব্বই মাইল দূরে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সন্ধে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল। বৃষ্টি হবে বুঝি। আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।

এমনসময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বুঝি তুমি পার না?

এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ। আমি বুঝলুম, আজ আমার আর নিস্তার নেই। বললুম, পারি নে তা নয়-- পারি। তবে কি না--

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলব করতে আরম্ভ করেছি। খানিকটা কাশলুম। একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি দেখে আসি, কে যেন এল।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদূতগুলো মোটের উপরে হাঁদা। একটু নড়তে গেলেই ধূপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেলশূল-ছুরিছোরাগুলো ঝন্ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।--

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌঁছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তাঁর নাম অরিজিৎসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তার পাগড়িটা অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতির সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেকবার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।--

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর দু দিন পরে। তোমার জন্য বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিজিৎ বললেন, অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুণ্ডিতে মুসলমান রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্যেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্যে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্য নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছে করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঙনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেকদিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিৎ বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা।

তাও নয়, আপনার রূপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিৎ বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহুদূর -সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ

হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলাম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখবাঁধা হাতবাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতির দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ওই বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কক্ষণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দূরপথে। নানা বিষয় কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মতো হয়তো পৌঁছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহরনিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্যে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পৌঁছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাল্গুনের শুরুপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌঁছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল



রঙের, গায়ে ওড়াল বাসন্তীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর  
বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমতো শোবার  
ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে।  
সুধাকান্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে  
দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোন উত্তর নেই। স্পর্শ করে  
বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষোড়ি ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

দিন-খাটুনির শেষে  
বৈকালে ঘরে এসে  
আরামকেদারা যদি মেলে,  
গল্পটি মনগড়া,  
কিছু বা কবিতা পড়া,  
সময়টা যায় হেসেখেলে।  
হেথায় শিমুলবন,  
পাখি গায় সারাখন,  
ফুল থেকে মধু খেতে আসে।  
ঝোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে  
সারাদিন সুর সেধে  
আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে।  
গোয়ালপাড়ার গ্রামে  
মেয়েরা নদীতে নামে,  
কলরব আসে দূর হতে।  
চারি দিকে ঢেউ তোলে,  
বটছায়া জলে দোলে,  
বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে।  
দিয়ে জুঁই বেল জবা  
সাজানো সুহৃদসভা,  
আলাপপ্রলাপ জেগে ওঠে--  
ঠিক সুরে তার বাঁধা,  
মূলতানে তান সাধা,  
গল্প শোনার ছেলে জোটে।

## ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।--

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খ'সে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রেই আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই ক'রে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া-- সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্টনাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ

থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাথ থেকে। এ'কে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কারদানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হয় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,  
মনে হ'ত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা।  
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি  
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।  
ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে  
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।  
মনে হ'ত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,  
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।  
তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,  
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।  
বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,  
উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।  
নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,  
অঙ্গরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।  
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই,  
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।

বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,  
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।  
পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে  
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।  
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিঁনি জানি তা--  
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিত।  
কলবল সম্বল সিঁড়িলাইজেশনের,  
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।  
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,  
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।  
মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,  
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিঁধা তা।  
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,  
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।  
আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে  
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

## ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুণ্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমানুষ তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই ব'লেই।

যেমন?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা। ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যালকাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা। শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাঙ্কেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা ক'রে।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অন্যমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু-- কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের দিন ছিল কী সুখের। গল্প লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে-- এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল; ব'লে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে।

কালকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালোমানুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অসুবিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখন সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে ক'রে চটপট সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে-- সেও ফিরবে না।

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান-মতে?

ভালোমানুষের কুণ্ঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমানুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব-- তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে-- ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে-- ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জন্মাও নি। তখন ব্রাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলাম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের সুরে বলেছিলাম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদ্বির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিলুম, ব্রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাচ্ছে বইখানা

তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

মণিরাম সত্যই স্যায়না,  
বাহিরের ধাক্কা সে নেয় না।  
বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে  
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।  
যোগ্যতা থাকে যদি থাক্-না,  
ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা।  
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে  
তবে সে আরাম পায় মনেতে।  
যেথা তারে নিতে চায় আগিয়ে  
দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে।  
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে;  
ঠেলা নাহি মারে পেলে সুবিধে।  
যদি দেখে টানাটানি খাবারে  
বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে।  
ব্যঞ্জে নুন নেই, খাবে তা;  
মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা।  
যদি শোনে, যা তা বলে লোকরা  
বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা।  
পাঁচু বই নিয়ে গেল না ব'লে;  
বলে, খোঁটা দিয়ো নাকো তা ব'লে।  
বন্ধু ঠকায় যদি, সহিবে;  
বলে, হিসাবের ভুল দৈবে।  
ধার নিয়ে যার কোনো সাড়া নেই  
বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই।  
যত কেন যায় তারে ঘা মারি  
বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

## মুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি খবর চাও; ফস্ করে জিঞ্জেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মানুষের। রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়াল হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুলঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে সূর্যমুখী, কুন্দনলিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাস্তনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগ্নে; নাম ছিল রণদুর্ধর্ষ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পায়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।--

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদুর্ধর্ষ বিদায় নিতে এলেন মুক্তকুন্তলার কাছে। মুক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়া জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে



আনতুম। ইঁটের উনুন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষি খিচুড়ি। তাতে না ছিল নুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিদ্রের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরেজুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুক যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধর্ষ পাশে এসে দাঁড়ালেন। বীরাস্তনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্তকুন্তলার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আড্ডায়। রণদুর্ধর্ষকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই বুঝবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম সে ছিলেম খাঁটি ছেলেমানুষ।

'দাদা হব' ছিল বিষম শখ--  
তখন বয়স বারো হবে,  
কড়া হয় নি দ্বক।  
স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,  
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে  
হয়েছিল দাদার অভিনয়;  
কাঠের তরবারি মেরে

দাড়ি-পরা বিপক্ষে  
বারে বারেই করেছিলুম জয়।  
আজ খসেছে মুখোশটা সে,  
আরেক লড়াই চারি পাশে--  
মারছি কিছু, অনেক খাচ্ছি মার।  
দিন চলেছে অবিরত,  
ভাবনা মনে জমছে কত,  
ষোলো-আনা নয় সে অহংকার।  
দেখছে নতুন পালার দাদা  
হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা  
এ সংসারের হাজার গোলামিতে।  
তবুও সব হয় নি ফাঁকি,  
তহবিলে রয় যা বাকি  
কাজ চলছে দিতে এবং নিতে।  
সাস্ত হয়ে এল পালা,  
নাট্যশেষের দীপের মালা  
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে;  
রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা  
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,  
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে।  
সময় হয়ে এল এবার  
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,  
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা;  
খাতা হাতে এখন বুঝি  
আসছে কানে কলম গুঁজি  
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।  
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা  
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা  
কোনোমতেই চলবে না তো আর;  
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে  
পড়বে ধরা শেষ গণিতে  
জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

লিপিৱা

## পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, 'বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।'

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, 'গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।'

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, 'কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।'

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, 'এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রী পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, 'তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করব।'

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, 'সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম--এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে। কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।'

রাজা বললে, 'ডাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা, ডাকো তাকে।'

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে।'

সে বললে, 'সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া-আসা।'  
রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় সে জায়গা।'  
পাগলা বললে, 'তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।'  
রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'সেইখানে পরী দেখা যায়?'  
পাগলা বললে, 'দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।'  
রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।'  
পাগলা বললে, 'কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।'  
রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।'

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।  
ফাল্গুনমাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।  
সবাই জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ।'  
সে কোনো জবাব করলে না।  
গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।  
এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, 'আজ পাব দেখা।'

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌঁছল কাম্যকসরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়ের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।  
রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, 'তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে?'

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল-- ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও।'  
রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।'

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, 'স্বপ্ন বুঝি ফলল--এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।'

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে; বললে, 'এসো।'

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহ কুহ কুহ কুহ।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কী।'

সে বললে, 'আমার নাম কাজরী।'

উদাসঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, 'এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।'

সে বললে, 'আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।'

রাজপুত্র বললে, 'আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।'

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, 'এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।'

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, 'এসব কেন!'

রাজপুত্র বললে, 'তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।'

তখন তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে ব'লে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে।

সে বললে, 'না, আমি যাব না।'

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা--ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, 'এ কেমনতরো পরী।'

রাজার মেয়ে বললে, 'ছি, ছি, কী লজ্জা।'

মহিষীর দাসী বললে, 'পরীর বেশটাই বা কী রকম।'

রাজপুত্র বললে, 'চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।'

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রি বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, 'পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো।'

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, 'আজ তোমাকে ছাড়ব না--নিজরূপ প্রকাশ করো, আমি দেখি।'

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে দুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, 'তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।'

সে বললে, 'না, আর নয়।'

রাজপুত্র বললে, 'তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।'

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা প'রে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল; পরীবৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপরসাদা কুন্দফুল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর, কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।'

## রাজপুত্র

রাজপুত্র চলছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্র সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খালবিলের জল খালবিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না।

রাজপুত্রকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, 'আমরা সেই রাজপুত্র।'

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্র সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দি, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, 'বন্দির উদ্ধার করে আনব।' বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, 'দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।'

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-চেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদুকরের জাদু।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্রের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশনি করে বাসাখরচ চালায়।



রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

টাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাতির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমনসময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, 'এ ছেলেকে কে বাঁচায়।'

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল, প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাঁঠা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, 'কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।'

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, 'হাঁউমাউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।' মানুষকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহুর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্র। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়-- সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন

করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,  
সে রাজপুত্র।

## মীনু

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় হাঁদার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, 'এও বাঁচে কি না-বাঁচে।'

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে ঝুমকোলতা লাগিয়েছিল। এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, 'বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।'

মীনুর স্বামী বললে, 'বড়ো হাস্যম, কাজ নেই।'

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে বসে কত কী বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখতে পেলে, তার জানলার নিচেকার গোলকটাপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃদুগন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেমন আছ।'

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে প'ড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, 'আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।'

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি হাতে পুজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীну দাইকে বললে, 'শীঘ্র ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন।'

ব্রাহ্মণ আসতেই মীну তাকে প্রণাম করে বললে, 'ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্যে।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'দেবতার জন্যে।'

মীну বললে, 'দেবতা তো ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'তোমাকে!'

'হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব'লে দেন নি।'

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ নাড়া দিতে শুরু করলে তখন মীну তার দাইকে বললে, 'ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।'

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীну তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, 'ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী সুন্দর ছেলেটি। ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও-না।'

স্বামী বললে, 'গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।'

মীну বললে, 'শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। সবার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।'

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, 'দরোয়ান বললে, বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।'

পরের দিন বিকেলে মীну দাইকে ডেকে বললে, 'ঐ চেয়ে দেখ, বাগানে একলা বসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।'

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, 'ওরা রাগ করেছে।'

'কেন, কী হয়েছে।'

'ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবে।'

এক মুহুর্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, 'আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।'

## নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা ঐকে, মাঝখানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখত, শ্রীকেশবদেবনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না।

মনে মনে সে স্থির করলে যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বললে, 'একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।'

সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগ্নেটি।

নতুন ক'খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চোঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, 'দেখো দেখো, মামা, এ যে তোমারই নাম।'

মামা একটুখানি হাসলে, আর আদর ক'রে খোকাকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের করে বললে, 'আচ্ছা, এটা পড় দেখি।'

ভাগ্নে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম আরও অনেক অনেক বইয়ে আছে-- একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?'

মামা চোখ টিপে বললে, 'ক্রমে দেখতে পাবি।'

ভাগ্নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক।

বন্ধুরা বললে, 'এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।'

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধু থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তার সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্নেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি ব্যস্ত।

'কী কানাই, কী করছিস।'

ভাগ্নে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কাণ্ড। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর, এ কী রকম খেলা।

কানাইয়ের বহু দুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কেঁদে ওঠে-- কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে, বাবা।'

কানাই বললে, 'আমার নাম।'

মা এসে বললে, 'কী রে কানাই, কী হয়েছে।'

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আমার নাম।'

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, 'আমার নাম।'

মা এসে বললে, 'কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।'

কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, 'আমার নাম।'

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হল।'

বন্ধু বললে, 'ওরা রাজি হল না।'

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, 'আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।'

বন্ধু বললে, 'আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না?'

ও বললে, 'না, আমার জ্বরভাব।'

বিকেলে মা এসে বললে, 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

ও বললে, 'খিদে নেই।'

সন্দের সময় স্ত্রী এসে বললে, 'তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?'

ও বললে, 'মাথা ধরেছে।'

ভাগ্নে এসে বললে, 'আমার নাম ফিরিয়ে দাও।'

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

## সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বন্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, 'খাও।' সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

সে গুমরে উঠে বললে, 'তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।'

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, 'সই, বসো। কথা আছে।'

স্যাঙাৎনি বললে, 'প্রকাশ করে বলো।'

সুয়োরানী বললে, 'আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনে রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা, ঘরখানি কার।' সে বললে, 'দুয়োরানীর।'

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে ঐকে দেব পদ্মের মালা।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পান্ধি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।



পথে ফিরে আসছি, পান্থিক দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে।'

ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলাম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমনসময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চুড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।'

ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্য নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধায়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, 'ঐ

দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।'

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, 'কেন বলো তো।'

সুয়োরানী বললে, 'ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।'

## ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাঙারীকে ডেকে বললেন, 'ওহে ভাঙারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।'

ভাঙারী হাত জোড় করে বললে, 'পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ-ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারি আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ ব্যোম, তা সে যত চাই।'

চতুর্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভালো, ভাঙারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।'

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাঙ থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্য-সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়-- পালাতে পালাতে একেবারে বৃন্দ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মংলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি-অপ-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এইরকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, 'এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো সুবিধে।'

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা-লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা

ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাখি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না; তবু, চুন বালি খ'সে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, 'একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।'

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠে-পড়ে ডাঙা চালালে যে, ওর আর লাখি চলল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, 'আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।'

তারা তারিফ করে বললে, 'তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।'

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাখি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তিগদগদ শোনাচ্ছে না। মুখ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।'

যম বললেন, 'সৃষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, 'আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।'

মানুষ বললে, 'ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক

খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।'

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।'

মানুষ বললে 'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।'

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দুটো পায়ে কষে রশি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ভুল করেছি তো।'

মানুষ হাত জোড় করে বললে, 'এখন এটাকে নিয়ে করি কী। আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।'

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।'

মানুষ বললে, 'আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।'

ব্রহ্মা বললেন, 'সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।'

## কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, 'আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।'

তা ব'লে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, 'ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, 'এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাপুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।'

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক--অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক-- শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের

খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভুতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভুতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভুতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চুড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, 'এমন হল কেন।'

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, 'এটা ভুতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।'

শুনে সকলেই বললে, 'তা তো বটেই।' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভুতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভুতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও।' আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, 'খাজনা দাও।'

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, 'খাজনা দেব কিসে'।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চুড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, 'বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকে, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না, 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।'

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে-- সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।'

মাসিপিসি বলে, 'বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাও, আর বর্গির দলকেও।'

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাতে হাত জোড় করে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।'

কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে, কর্তা।'

কর্তা বলেন, 'সেইখানেই তো ভূত।'



## তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না।  
লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া  
রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের  
অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা  
বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে,  
দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে  
হৃদমুদ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি  
দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির  
কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া  
এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল,  
'সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের  
দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত  
তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করা ঘটা দেখিয়া সকলেই  
বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল  
আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া  
কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিস্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'এ কী বেয়াদবি।'

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগির্নীর গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়।'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে।'

'না।'

'আর কি গান গায়।'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেষ্টায়।'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

## নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমনসময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, 'লোকটা সাহস দেখিয়েছে।'

প্রবীণের দল বললে, 'একে বলে সাহস? এ তো স্পর্ধা।'

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, 'আমাদের এই পুতুল চাই।'

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, 'আরে ছিঃ।'

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুলহাটের সর্দার।

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, 'তুমি আমার বাড়িতে এসো।'

জামাই বললে, 'খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।'

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাথনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় ব'সে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাথনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কী দাদি, কী চাই।'

নাথনি বলে, 'আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।'

বুড়ো বলে, 'আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন।'

নাথনি বলে, 'তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।'

বুড়ো বলে, 'কেন, কিষণলাল।'

নাংনি বলে, 'ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!'  
দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।  
তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাংনিকে বলে, 'কিন্তু দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।'  
নাংনি বলে, 'দাদা, আমি কাক তাড়াব।'  
বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাংনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে; হুঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, 'দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।'

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুভদ্রা খেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।'

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।'

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, 'দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।'

দু দিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, 'এই নাও, আমার দাদার পুতুলের দাম।'

মা বললে, 'কোথায় পেলি।'

মেয়ে বললে, 'রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।'

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, 'দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।'

মা খুশি হয়ে বললে, 'এমন ষোলোটা মোহর হলেই তো সুভদ্রার গলার হার হবে।'

বুড়ো বললে, 'তার আর ভাবনা কী।'

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।'

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে হাঁদারায় বলদে কঁ্যা-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, 'এখন বর এলেই হয়।'

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, 'দাদাভাই, বর ঠিক আছে।'

দাদা বললে, 'বল্ তো দাদি, কোথায় পেলি বর।'

সুভদ্রা বললে, 'যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।'

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'সে আছে কোথায়।'

নাংনি বললে, 'ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।'

বর এল ঘরের মধ্যে; বুড়ো বললে, 'এ যে কিষণলাল।'

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'হাঁ, আমি কিষণলাল।'

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।'

নাংনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, 'দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।'